বীজমন্ত্র

ঢোকার মুখে কাচের দরজায় গোটা গোটা অক্ষরে: পেছনের দরজা ব্যবহার করুন। নিচে ইংরেজিতে: প্লিজ ইউজ রিয়ার ডোর। দরজার হাতল ডান দিকে অর্ধেকটা ঘুরিয়েছে, এমন সময় লেখাটা চোখে পড়তে হাত সরিয়ে নিল তপু। কী ব্যাপার, ঢুকতে মানা করছে কেন? হাতলে চাপ পড়ামাত্র দরজাটা খুলি-খুলি করছিল, একটু হলে খুলে যেত। দরজার ওপারে আলো কম, কাচটাও টিন্টেড– ভেতরে কেউ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় এখানে দাঁড়ানোও অশোভন। পেছনের পথটা কোন দিকে?

তপু সরে দাঁড়াল। বড় রাস্তায় ফিরে বাড়িটাকে ভালো করে খেয়াল করল। বাড়ি নয়, ভবন। মাঝারি উচ্চতায়, চোখে পড়ে এমন জায়গায় দুধসাদা মার্বেলে নামফলক: কর্মীসংঘ। ভবনের অন্য কোথাও সাদার চিহ্ন নেই; মসৃণ কালো মার্বেল টাওয়ার খাড়া উঠে গেছে মহাশূন্যে। এক দুই তিন পাঁচ করে আঠারো পর্যন্ত গুনল তপু। আর পারল না, গুলিয়ে ফেলল।

শহুরে কোলাহল থেকে দূরে ছিমছাম গাছপালায় নিরিবিলি, প্রায় অবাস্তব ভবনটা তাকে চুম্বকের মতো টানতে লাগল। কিন্তু পথ কোন দিকে? আশপাশে মানুষজন নেই যে জিজ্ঞেস করবে। বেলা সোয়া দশটায় জায়গাটা নিঃসাড়, জনশূন্য। মাঝে মাঝে দু-একটা গাড়ির হুস্ হাস্, এই পর্যন্ত। আর কোনো শব্দ নেই, কলরোল নেই। এত বড় দৈত্যপুরী, প্রতি তলায় কাচবসানো ওগুলো কি জানালা? জানালা হলে আটকানো কেন? লোকজন কোথায়? জানালায় একটাও মুখ নেই কেন?

বুকপকেট থেকে খাম সমেত টাইপ করা চিঠিটা বের করে তপু। গত সন্ধ্যায় পেয়েছে এটা। এরই মধ্যে শ-খানেকবার পড়া হয়ে গেছে। নতুনত্ব কিছু নেই, তার পরও ভাঁজ খুলে চোখ বোলাতে রোমাঞ্চ হলো। প্রিয় পদপ্রার্থী, জাতীয় কর্মীসংঘ এই মর্মে সন্তুষ্ট যে, একজন মেধাবী, সৃষ্টিশীল, প্রাণচঞ্চল তরুণ হিসেবে আপনাকে সংঘের সুবিশাল কর্মযজ্ঞে যোগদানের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়েছে। আগামী অমুক তারিখ তমুক জায়গায় আপনাকে স্বাগত জানানো হবে। নিচে স্বাক্ষর অস্পষ্ট, সিল স্পষ্ট, তাং....। দামি অফসেট কাগজ, পেশিবহুল দুটো হাত আড়াআড়ি করে আঁকা মনোগ্রাম, ভেতরে একটুখানি ফাঁকা– তাতে 'কর্মই উৎস'।

চিঠিটা যখন বাসায় পৌঁছে, তপু বাইরে ছিল। ছোট বোন মিনির হাতে পড়ে ওটা। মিনির হবি, কেবল হবি বললে পুরোটা বলা হয় না, ফেবারিট হবি অন্যের চিঠি পড়া– চেনা-অচেনা যে-কারো চিঠি। প্রেম-ভালোবাসার চিঠি হতে হবে এমন কথা নেই। বিয়ের ঘটকালি, জায়গাজমির মামলা, পাওনাদারের গালাগালি, মৃত্যুসংবাদ যেকোন বিষয়ের চিঠিই তার কাছে সমান কৌতূহলের। এমনকী চিঠির গন্ধ শুঁকে বাজারের ঠোঙা খুলে মর্ম উদ্ধারেও সে মহা আগ্রহী।

তপু ফিরল সাতটা-সাড়ে সাতটার দিকে। এদিকে মিনি অবিশ্বাস্য চিঠির কথাটা ঘরে সবার কাছে ফাঁস করে হুলস্থূল বাঁধিয়ে বসে আছে। প্রিয় হবির জন্য এই প্রথম সে বকাঝকা খেল না। অনেক রাত পর্যন্ত বাসায় উৎসব-উৎসব ভাব বজায় থাকল। বাবা-মা, ছোট বোন মিনি, বড় বোন রিনি (বিয়ের মাত্র এক বছর পর স্বামীর ঘর ছেড়ে এ সংসারে যে এঁটো কাঁটা হয়ে এর ওর পায়ে বিঁধেই চলেছে), বড় ভাই রাজীব (বি-কম পাশ করে আট বছর চাকরির ধান্দা করতে করতে ইদানীং প্রায়–দার্শনিক একটা কথা বলে, চুরি-ডাকাতিতেও যোগ্যতা লাগে; কথা শুনে একদিন তপু-রাজীবের বাবা আহমদ হোসেন তেড়ে এসেছিলেন, কী মনে করো, লাগে না? ন্যাকা!) সবাই যার যার মতো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। আহমদ হোসেন বাড়াবাড়ি করলেন, রাত আটটায় বৃষ্টি ভেঙে কোথা থেকে খাসির মাংস নিয়ে ফিরলেন। বৃষ্টি-জবজব ছাতা ভেঙে ঘরে ঢুকেই যেন লজ্জা পেলেন, মাংসের পুঁটলিটা বড় মেয়ের হাতে দিয়ে খুব আক্ষেপ করলেন, কী কাণ্ড দেখ্ তো, আগে জানলে সকালবেলা ফ্রেশ মাংস নিয়ে আসতাম; বলেছে তো টাটকা, এদের কথা! শোন, একটু বেশি করে পেঁয়াজ, রসুন দিবি।

রাতের খাওয়া হয়ে গেছে এমন সময় রাজীব এসে বসল তপুর বিছানায়। এমনিতে দু'জনের বড় একটা কথাবার্তা হয় না। মনে মনে রাজীবকে তপু ঘৃণাই করে। আট বছর বেকার থাকার ব্যর্থতা অন্য কারো ওপর চাপানো যায় না। রাজীব বলল, চিঠিটা একবার দেখতে দিবি? কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল, দাদা এভাবে কথা বলছে কেন? অন্য সবার হাত ঘুরে ঘুরে চিঠিটা টেবিলের ওপরই ছিল। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিতে রাজীব খুব আগ্রহ নিয়ে চিঠিটা পড়ল, খামের ঠিকানা পড়ল, আবার চিঠিটা উল্টেপাল্টে নেড়েচেড়ে বলল, বড় সাজগোজের চিঠি রে, ম্যালা মালকড়ি, না? তপু বলল না কিছু, নিজেকে একটু অপরাধী ভাবল। চিঠিটা এরপর নাকের কাছে ধরে রাজীব বলল– গন্ধটা কী ডেলিশাস!

রিনির প্রতিক্রিয়া আলাদা। বিয়ের সময় কে যেন তাকে একটা শেফার্স বলপেন উপহার দিয়েছিল। কলমটা সে কাছ-ছাড়া করত না। বিয়ের স্মৃতি হিসাবে কলমটাই হয়ত ছিল মূল্যবান। সকাল বেলা তপু জামাকাপড় পরছে, রিনি কলমটা তার শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে বলল, তোকে দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই, এটা নে।

বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে তপু নাশতা খেয়েছে, জামাকাপড় পরে বাইরে বেরিয়েছে। গত রাতটা অস্থিরতার ভেতর দিয়ে গেছে। বিছানায় একরকম ছটফট করে কাটিয়েছে। এমন অভাবনীয় সংবাদ, অথচ রত্নার কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে না, যন্ত্রণাটা তাকে বিঁধছিল। গত দিন সকালে যখন রত্নার সঙ্গে দেখা হলো, তখন কে জানত রত্নাকে দেওয়ার মতো এমন একটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করে আছে। রাতে তার খুব ইচ্ছে করছিল, যে করেই হোক রত্নাকে খবরটা দিয়ে আসে। কিন্তু কাঁঠালবাগান আর মিরপুরের দূরত্ব কম নয়, তার ওপর বৃষ্টি।

আজ সকালে রত্নাকে যখন তপু খবরটা দিল, কয়েক মুহূর্ত রত্না শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তপু অপেক্ষা করে ছিল, রত্না কী করে। রত্নার প্রতিক্রিয়া একেবারে অন্যরকম। তার চোখ-মুখ খুশিতে নেচে উঠল না, বরং দু'চোখ বড় বড় টলমল ফোঁটায় ভরে উঠল। একসময় দু'হাতে মুখ আড়াল করল।

ঘড়ি দেখে তপু চমকাল, এগারোটা বাজে প্রায়। চিঠিতে ঠিক এগারোটার কথা বলা আছে। তড়িঘড়ি করে চিঠিটা পকেটে ভরে বড় রাস্তা থেকে আবার ভবনের সামনে চলে এল। এবার আর দরজার মুখে না দাঁড়িয়ে সামনা বরাবর হাঁটতে লাগল। কেন জানি ধারণা হলো, ভবনের শেষ মাথায় ঘুরপথে ঢোকার রাস্তাটা হয়তো পেয়ে যেতে পারে। ধারণাটা যে এভাবে ফলে যাবে, তপু ভাবতে পারেনি। ঠিক যেখানে ভবনের সীমানা শেষ, তার ওপারে একটু দূরে খাড়া দেয়াল, মাঝখানে কংক্রিটের ঢালু সুড়ঙ্গ, অনেকটা বেসমেন্টে গাড়ি ওঠানামার পথের মতো। কী করবে, যাবে কি যাবে না ভাবছে, এমন সময় দেয়ালের গায়ে চোখ পড়ল– রিয়ার ডোর, পাশে তীর চিহ্ন।

তপু ছুটতে শুরু করল, একে ঢালু পথ, তার ওপর দ্রুত পা ফেলায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুড়ঙ্গের ভেতর। আধো অন্ধকার, মিটমিটে হলুদ বাতি জ্বলছে দেয়ালের গায়ে। পরপর দুটো বাঁক ঘুরল তপু, তারপর হঠাৎ করেই সুড়ঙ্গ পার হয়ে বিশাল হলঘরের মতো জায়গায় এসে পড়ল। চারপাশে ঝলমলে আলো, এত আলো, তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তকতকে মেঝে, মসৃণ দেয়াল, ঘরময় মিহি শীতল সুবাস। তপু ঘড়ি দেখল, এগারোটা বাজতে মিনিটখানেক বাকি। সুড়ঙ্গ ধরে দৌড়ে নামায় তার বুক দ্রুত ওঠানামা করছে, এদিকে ঘড়ির কাঁটা তাকে পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে। এত দূর এসে এবার কী করবে তপু ভেবে পেল না। এমন সময় সে খেয়াল করল ঘরের ভেতর ছোট ছোট টেবিল জুড়ে অনেক মেয়ে-পুরুষ। তাকে কেউ লক্ষ করছে না। সবচেয়ে কাছের টেবিলটা হাত-পনেরো দূরে। বুক–উঁচু টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে একটা মেয়ে। কাছে–দূরে আরো ক'টা টেবিল দেখতে পেল, প্রতি টেবিলে হয় কোনো ছেলের মুখ, নয় মেয়ের। তপু ছুটল। কাছের টেবিলের মেয়েটাকে লক্ষ করে এগিয়ে গিয়ে গত সন্ধ্যার চিঠিটা বাড়িয়ে ধরামাত্র অপরূপ সুরের মূর্ছনা তুলে গোটা হলঘর জুড়ে বেলা এগারোটার সময় সঙ্কেত বেজে উঠল। চিঠিতে একনজর চোখ বুলিয়ে মেয়েটা পাশের র‍্যাক থেকে চারকোনা কার্ড তুলে কী সব লিখতে শুরু করল। তপু কথা বলতে চাইল, কিন্তু এই পরিবেশে কথা বলায় কোথায় যেন অলিখিত নিষেধাজ্ঞার ব্যাপার আছে। কার্ডে মেয়েটা চটপট কী সব নম্বর বসাচ্ছে। কলম চালানোর তালে খোলামেলা মসৃণ কাঁধে রেশম-মিহি চুল দোল খাচ্ছে, উঁচু টেবিলে চাপ খেয়ে ফরশা স্তন বেলুনের মতো ফুলে উঠছে।

মিনিট দুয়েকের ব্যাপার, কার্ডে লেখাজোখা শেষ করে সেটা তপুর হাতে দিয়ে মেয়েটা অন্য একটা টেবিলে যেতে ইঙ্গিত করল। এ টেবিলে যার মুখ, সে মেয়ে নয়, বছর তিরিশের গোমড়ামুখো যুবক। কার্ডে কী একটা চিহ্ন বসিয়ে ঝটপট তাকে আরেক টেবিলে পাঠাল। এও একজন মেয়ে, অনেকটা প্রথম জনের মতো, তেমনি বেলুনস্তন। মুখ তুলে সে একটুখানিক শুষ্ক অভ্যর্থনার ভঙ্গি করল। তপু মুখ খুলতে যাবে, তার আগেই কার্ডে একটা টিক মেরে তাকে পাঠিয়ে দিল উল্টো পাশের টেবিলে। আবার গোমড়া মুখ, গোমড়া মুখ থেকে বেলুন, বেলুন থেকে গোমড়া। গোমড়া, বেলুন, বেলুন, গোমড়া।

কতক্ষণ এই করে কেটে গেছে তপু বলতে পারবে না। একসময় খেয়াল হলো, সে এসে পৌঁছেছে হলঘরের শেষ মাথায়। এখানে এক জন গোমড়ামুখো তার সাথে ব্যতিক্রমী আচরণ করল। কার্ডে দাগ মেরে তপুর দিকে হাত বাড়িয়ে গমগমে গলায় বলল, আপনাকে স্বাগতম। গলায় আন্তরিকতার আভাস নেই, চেহারাটা এমনভাবে সেলাই করা যাতে অন্য কোনো অভিব্যক্তি না ফোটে। ঠাণ্ডা হাতটা ছেড়ে তপু দেখল ঠিক পাশেই কাচের দরজা, মাঝখানে লাল হরফে প্রবেশ। নিচে ইংরেজিতে: এন্ট্রি। লোকটা কি তাকে ভেতরে যেতে বলছে? ভাবাভাবি বাদ দিয়ে তপু কেবল দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে, লোকটার গলা শোনা গেল– আজ না, কাল এগারোটায়।

ফিরতিপথটা অত দীর্ঘ মনে হলো না। ঢোকার সময়ের মতো অনেক কিছুই সে খেয়াল করল না। বোধশক্তি কেমন ভোঁতা। বাইরে এসে দাঁড়াতে খেয়াল হলো কপালে, গলার খাঁজে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। ঘড়িতে বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট। মাত্র এইটুকু সময়, অথচ মনে হচ্ছিল কয়েক ঘণ্টা।

হাঁটতে হাঁটতে কর্মীসংঘের ভবন ফেলে অনেকটা দূরে চলে আসতে কার্ডটার কথা মনে পড়ল। চিঠিটা ওরা রেখে

দিয়েছে তবে কার্ডটা যত দূর মনে পড়ে, যে লোকটা আপনাকে স্বাগতম বলেছিল, সে দাগ মেরে ফেরত দিয়েছে। বুকপকেটে হাত ছোঁয়াতেই কার্ড পাওয়া গেল। বের করে আনতে চিত্রবিচিত্র আঁকিবুকি। উপরে গোটা গোটা অক্ষরে তার নাম, পাশে পরপর কয়েকটা নম্বর। এরপর কার্ডের এপিঠ-ওপিঠ জুড়ে নানা রঙের বিদঘুটে চিহ্ন, আঁকিবুকি। কোনোটা পরিষ্কার টিক মার্ক, কোনোটা হিসাব মেলানোর পর ক্যাশের লোকেরা যেমন চিহ্ন দেয় সে রকম, কোনোটা গোল্লা, হাফ-গোল্লা, চন্দ্রবিন্দু, আবার শুধু বিন্দুও আছে। লাল, সবুজ, কালোর পাশাপাশি হলুদ, বেগুনি রঙ দগদগ করছে।

বাসায় গেল না তপু, রত্নার কাছেও না। তার ঘোরের মতো লাগছে। চিঠি পাওয়ার সাথে চাকরির যোগসূত্র নিয়ে সন্দেহ হতে লাগল। সারা দিন এদিক সেদিক ঘুরে কাটাল। রত্নার মুখোমুখি বসে আলাপ করলে হয়ত হাল্কা লাগত, কিন্তু এ অবস্থায় রত্নার সামনে পড়তে ইচ্ছে হলো না। রত্না শক্ত মেয়ে নয়, হয়তো ভেঙেই পড়বে। পাশ করে ভাইয়ের সংসারে রত্না বোঝার মতো পড়ে আছে। বাচ্চাদের স্কুলে-টুলেও একটা কাজ জোটাতে পারছে না। আজ সকালে তপুর চিঠি পাওয়ার খবর শুনে রত্নার কেঁদে ফেলাই প্রমাণ, সে কতটা অসহায়।

রাতে ঘরে ঢুকে শরীর খারাপের কথা বলে সবাইকে পাশ কাটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করল তপু। ফল হলো উল্টো, মা চেপে ধরলেন। হঠাৎ করে শরীর খারাপ কেন? মাথা ধরা, জ্বর, নাকি আর কিছু? তপু রাগারাগি করল, শরীর খারাপ হলে এমনিতেই সে একটু বেশি হৈ চৈ করে। এত করেও বাবাকে এড়ানো গেল না। পোড়াখাওয়া মানুষ, সৌজন্যের খাতিরে একবার ছেলের কপালে হাত রেখে আসল কথাটা পাড়লেন, এপোয়েন্টমেন্ট লেটারে তো সেলারি, এলাউন্স কিছু লিখল না, কত পাবি বল তো? তপু এক কথায় পার পেতে চাইল, সবে তো আজই গেলাম, কাল জানব। আহমদ হোসেন আকাশ থেকে পড়লেন, বলিস কী! জয়েন করলি, বেতন জানিস না? কোলিগদের কাছ থেকে জানতে পারলি না! একাউন্টসে কথা বললেই তো...

রাতটা কাটল। ঘুমের ভেতর খাপছাড়াভাবে কয়েক বার হলঘরটা দেখল তপু, আর দেখল বেলুন– অসংখ্য, রং-বেরঙের বেলুন ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে।

পরদিন সুড়ঙ্গপথে পা দিয়ে তপু তাড়াহুড়ো করল না, হাতে যথেষ্ট সময়। ঢালু বেয়ে নামতে চারপাশে তাকাল। গতকালের মতোই লাগছে, টিমটিম আলোয় আবছা পথ। ধীরেসুস্থে বাঁক দুটো পেরুলো। তারপর হঠাৎ করেই সুড়ঙ্গের শেষ, হলঘরের শুরু। আজ প্রস্তুতি থাকায় আলোর ঝাপটা চোখে চাবুক মারল না। সার-সার ছোট-ছোট টেবিল, টেবিলের ওপর টবে বসানো মুখ; ছেলে মুখ, মেয়ে মুখ। মাঝখানে বিস্তর ফাঁকা জায়গা, একটা টেবিল থেকে অন্য টেবিলের দূরত্ব কম হলেও দশ থেকে পনেরো হাত। তপু এগোতে এগোতে গতদিন যে টেবিল থেকে ফেরত এসেছিল, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। পাশেই সেই কাচের দরজা, দরজায় গায়ে প্রবেশ ও এন্ট্রি। পকেট থেকে কার্ডটা বের করে টেবিলে রাখতে লোকটা চোখ তুলে তাকাল, তবে গত দিনের মতো স্বাগতম-টাগতম বলল না। কার্ডে চোখ বুলিয়ে টেবিলের ওপারে উঁচু টুল থেকে নেমে এল, তারপর কাচের দরজার নব ঘুরিয়ে পিছু পিছু আসতে ইঙ্গিত করল।

লম্বা করিডোর, দু'পাশে ভেতর থেকে বন্ধ দরজা। করিডোরে পা দিয়ে এই প্রথম তপু কয়েক জন মেয়ে-পুরুষকে স্বাভাবিক ভাবে চলাচল করতে দেখল। চলার ভঙ্গিতে ব্যস্ততা থাকলেও স্বাভাবিক হাঁটাচলা তাকে আশ্বস্ত করল। তপু যাকে অনুসরণ করছে, সে একটা লিফটের দরজায় থামতে, তপুও থামল। পরপর কয়েকটা লিফট, দরজা খুলছে, বন্ধ হচ্ছে, লোকজন উঠছে নামছে। হলঘরের একঘেয়েমির চেয়ে ভিন্ন চিত্র। আজকের দিনটা গতকালের মতো নয়, তপু ভাবল।

দশ-বাই-বারো'র ঘরটা কী ভীষণ ঠাণ্ডা! লিফটে করে লোকটা তপুকে নিয়ে এসেছে বাইশ তলার ওপর এই মাঝারি আয়তনের ঘরে। তপুকে বসিয়ে সে চলে গেল। তিনটা চেয়ারের মাঝেরটায় তপু বসে, দু'পাশে চেয়ার দুটো খালি, সামনে সাধারণ মাপের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, টেবিলে কাগজপত্র নেই, একটা মাত্র ইন্টারকম, টেবিলের ওপাশে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের হাতে ধরা তপুর কার্ড। প্রৌঢ় ড্রয়ার খুলে একটা ফোল্ডার বের করলেন, তারপর তপুকে চমকে দিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলে উঠলেন– তপন হায়দার, এজ টুয়েন্টি সেভেন, ফাইভ ফিট নাইন এন্ড হাফ, ব্ল্যাক মোল অন রাইট আর্ম, চেস্ট থারটিসেভেন, নন স্মোকিং, মাস্টার্স ইন সোসাল ওয়েলফেয়ার, আনম্যারেড, রেডি টু আনডারটেক চ্যালেঞ্জিং এসাইনম্যান্ট, এক্সপেকটেড সেলারি ফাইভ থাউজেন্ড। ফাইভ থাউজেন্ড?

ভদ্রলোক যা-যা বললেন, চাকরির দরখাস্তে তপু নিজ হাতে লিখে দিয়েছিল। চাকরির বিজ্ঞাপনে দরখাস্ত হাতে লিখতে হবে এমন শর্ত ছিল। ড্রয়ার থেকে ভদ্রলোক যে ফোল্ডারটা বের করলেন তাতে নিশ্চয় দরখাস্তটা রয়েছে।

–ফাইভ থাউজেন্ড?

তপু আমতা-আমতা করল। প্রথম চাকরি হিসেবে কি টাকার অংকটা বেশি হয়ে গেছে! কিন্তু এ রকম অংকই যে তার দরকার। মুহূর্তে বাবা মা রিনি মিনি রাজীবের মুখগুলো ভেসে উঠল। রত্নার মুখটা ভেসে ওঠার কিছু নেই, সারাক্ষণ বুকের মধ্যে আছে।

টাকার কথায় তপু গেল না, বলল, আমার চাকরি খুব দরকার, আই নিড দ্যা জব বেডলি।

–চাকরি বলছেন কেন? আমরা এখানে কেউ চাকরি করি না। উই আর কমিটেড টু আওয়ারসেলভস, চাকরিতে কারো কমিটমেন্ট থাকে না। আমাদের মনোগ্রামে লেখাটা খেয়াল করেননি? কর্মই উৎস। এখানে সবাই কর্মী, আমরা কাজ করি, একটিভিটি জেনারেট করি। উই আর অল পার্টনার্স ইন হিউজ একটিভিটি। তবে হ্যাঁ, কাজের বিনিময়ে আমরা রেম্যুনারেশন পাই, হ্যান্ডসাম রেম্যুনারেশন। ফাইভ থাউজেন্ড... দ্যাটস পিনাট!

তপু কথা বলতে পারল না; সে যা ভেবেছিল ঘটনা তার উল্টো। দরখাস্তে টাকার অংকটা বসাতে গিয়ে সে অনেক ভেবেছে। শেষমেশ পাঁচ হাজারের অংকটা যখন সাহস করে লেখা হয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল বেশি চাইতে ক্ষতি কী! এখন?

প্রৌঢ় তার দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখে ভারী চশমা, টকটকে ফরসা গায়ের রং, কপালটা বড় হতে হতে মাথার আধাআধি গিয়ে ঠেকেছে। এই মানুষটার পরিচয় তপু জানে না। ঢোকার সময় দরজায় কোনো নেমপ্লেটও লক্ষ করেনি। তবে যে ঢঙে আলাপ করছেন তাতে সন্দেহ থাকে না ইনি একজন কর্তাব্যক্তি।

–বাড়িতে কে কে আছেন?

–বাবা-মা আর ভাই-বোন।

–আর?

রত্নার কথাটা বলা যায় না, রত্না তো এখনো হিসেবে আসেনি। তপু মাথা নাড়ল।

–এই তাহলে, আর কেউ নেই?

–নাহ্।

–ঠিক আছে, উই উইল টেক গুড কেয়ার অব ইউ! পাঁচ হাজার চেয়েছেন, সেটা আপনার হিসাব। আমাদের হিসাব আলাদা, সে-হিসাব এর বেশি, অনেক বেশি। বেশিতে তো আপত্তি থাকার কথা না, কম হলে আপত্তি...

প্রৌঢ় হাসলেন, কিন্তু এ ধরনের কথায় হাসিটা যেমন খোলামেলা হওয়ার কথা, তেমন হলো না বরং রংহীন, বিবর্ণ হাসি। এত ফ্যাকাশে, রক্তহীন হাসি আর কাউকে হাসতে দেখছে বলে তপুর মনে পড়ল না। হাসিটা বাংলা সিনেমার ভিলেনের মতো নয়, বজ্জাতির চিহ্নমাত্র নেই, 'আবার শত দুঃখেও নলিনী চন্দ্রের হাসি পাইল' এমনও নয়। খোঁচা খাওয়া হাসি, মুখটা বেঁকেচুরে গেল।

ইন্টারকম তুলে কফি চাইলেন প্রৌঢ়। ঠাণ্ডা ঘরে উত্তেজনায় ভেতরটা লাফাচ্ছে তপুর। গত দিনের দ্বিধা-সংশয় কেটে গেছে। প্রৌঢ়কে অমায়িক বলতে হবে, বাড়ির কথা পর্যন্ত জানতে চাইলেন। একে কি নিচের হলঘরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে? ওরা মুখে খিল এঁটে বসে কেন? কিংবা সামনের দরজার বদলে পেছনের দরজা?

কফি শেষ হতে ভদ্রলোক হাত বাড়ালেন। তপু চট করে দাঁড়িয়ে হাতটা নিল। চমকে গেল সে, ঠাণ্ডা বরফশীতল হাতটা তাকে কামড়ে দিল।

পাঁচ হাজার টাকার অংক শুনে আহমদ হোসেন প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, বলিস কী! যা চেয়েছিলি তাতেই রাজি, এমনও হয়!

তপু বলতে পারত, পাঁচ নয়, পাঁচের বেশি, হতে পারে পাঁচের দ্বিগুণ; কিন্তু এইটুকু শুনে বাবা যেভাবে লাফিয়ে উঠলেন, বাড়িয়ে বললে নির্ঘাৎ অবিশ্বাস করবেন।

রিনি এসে বলল, বলেছিলাম না, তোর ভাগ্যে বেকারত্ব নেই, ওটা দাদার কপালে। দেখলি তো, কত বড় চাকরি জুটে গেল!

তপু মনে করতে পারল না এমন ভবিষ্যদ্বাণী রিনি কবে করেছিল। তবু রিনির মুখে কথাটা শুনে খুব ভালো লাগল। তপু জানে, রিনির একটা খুব গোপন প্রেম আছে। ছেলেটা ব্যাংকে ছোটখাটো চাকরি করে। আগের বিয়েটা রিনির বড় দায়সারা ভাবে সেরেছিলেন আহমদ হোসেন। বিয়েটা মোটেও বিয়ের মতো হয়নি। হয়তো সে কারণেই ওটা টিকল না। রিনির যদি আবার বিয়ে দেওয়া যায়, সেই প্রেমিক ছেলেটার সাথে!

সারাটা সন্ধ্যা তপু কাটাল রত্নাকে নিয়ে রিকশায় ঘুরে ঘুরে। রত্নার চোখমুখ তৃপ্ত। হুড-তোলা রিকশায় রত্নার কোমর জড়িয়ে ধরে এরাস্তা ওরাস্তা অনেক ঘুরল। ফেরার কথা বলে রত্না অন্য দিনের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ল না। রাত আটটার দিকে রত্নাকে নামিয়ে দেওয়ার সময় তপু অনেকক্ষণ ধরে তার ঘাড়ে-গলায় মুখ ঘষল। সুড়সুড়ি লাগলেও রত্না বাধা দিল না।

রাতে ঘুমোতে গিয়ে একটা হিমঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ তপু কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না।

পরদিন ঝুটঝামেলা ছাড়াই তপু কর্মীসংঘের একজন হয়ে গেল। কিছু কিছু বিভ্রান্তিকর ব্যাপার মনে উঁকি দিলেও সে গায়ে মাখল না। নতুন চাকরির উত্তেজনার চেয়ে তাড়নাটাই অনুভব করল বেশি। ঘরে আহমদ হোসেনের মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ তো আছেই, অন্যদের বেলাও সেটা কম কিছু নয় (কেবল রাজীবের প্রতিক্রিয়াটা সঙ্গত কারণেই কিছুটা প্যাঁচালো)। অন্যদিকে রত্না তো একাই একশো। রত্না আর চাকরি, দুটো জিনিস যে জট পাকিয়ে একাকার হয়ে আছে, তপু আগে কখনো উপলব্ধি করতে পারেনি।

এক দিন দুই দিন কেটে গেল। তপু বসে বসে হাই তুলে সময় পার করে দিল। তাকে কিছু করতে দেওয়া হয়নি। কেবল দ্বিতীয় দিনে একটা কাগজে দস্তখত দিতে হলো। আগে কখনো কাজ করেনি বলে অফিস-আদালতের কাগজপত্র তার অচেনা। তবে এটা যে বেতনের বিল জাতীয় কাগজ, পরিষ্কার বোঝা গেল। টাকার অংকটা তিন-চারবার পড়ল। দশ হাজার ছাড়িয়ে শতক, দশক, এককের ঘরেও খুচরা অংক। ভয়াবহ ব্যাপার, কাগজটায় সে দস্তখত করল। এ দুই দিন আর কারো দেখা পেল না তপু। তৃতীয় দিন বুদ্ধি করে বাসা থেকে কিছু পত্রপত্রিকা এনে রেখে দিল ড্রয়ারে। একঘেয়েমি কিছুটা এতে কাটল, কিন্তু ঘন ঘন এত বেশি হাই উঠতে লাগল, তার ভয় হলো ঘুমিয়ে না পড়ে। আকাশছোঁয়া ভবনের বাইশ তলায় একটা মাঝারি আয়তনের ঘরে সময় কাটানোটাই বিড়ম্বনার মতো মনে হলো।

দুপুরের দিকে পা টিপে টিপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কেন জানি মনে হলো, তার এই বেরিয়ে আসার সাথে গোপনীয়তার একটা যোগাযোগ রয়েছে। দু'পাশে ভেজানো দরজা, সামনে অন্তহীন করিডোর। কোথায় এর শেষ, তপু আন্দাজ করতে পারল না। একেকটা করিডোর কিছু দূর পরপর ডানে-বাঁয়ে শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে গোলকধাঁধার সৃষ্টি করেছে। কয়েকটা ভেজানো দরজা পার হলো তপু। দু'পাশে দেয়ালের গায়ে নানা ধরনের সাঙ্কেতিক চিহ্ন, সঙ্কেতগুলো বুঝতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। একটা দরজার সামনে সে থামল। ভীষণ ঔৎসুক্য জাগল, যদি দেখা যেত ওপাশে কী? ভাবতে না ভাবতে সে কাজটা করে ফেলল। হাতলে মৃদু চাপ দিতে দরজাটা খুলে গেল। মস্ত ঘর, নিচের হলঘরের মতো, সার-সার টেবিল, মাথা ঝুঁকিয়ে কাজে ব্যস্ত অগুনতি নারী-পুরুষ। আগন্তুকের উপস্থিতি ওরা লক্ষ করল না কিংবা গ্রাহ্য করল না। বেশিক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয়, দরজাটা ছেড়ে তপু এগোল। এবার উল্টোদিকের একটা দরজার হাতল ঘোরাল। মাথা বাড়িয়ে সে অবাক হলো, এটা কি অফিস, না শাকসবজি, ফলমূলের নার্সারি। চারপাশে কাচমোড়া বিশাল খামার, সবুজের সমারোহে দৃষ্টি অবশ হয়ে এল। গ্রীন হাউজ? দরজা ছেড়ে তপু হাটল। কিছু দূর গিয়ে আবার দরজার হাতলে হাত; যন্ত্রপাতিঠাসা ঘর, নানা বর্ণের আলো ঠিকরে যন্ত্রগুলোর চেহারা কী রকম মোহময়।

একের পর এক দরজা তপু মেলে ধরছে, ফের বন্ধ করছে। কাজটা উচিত না অনুচিত, এ নিয়ে ভাবাভাবিতে যাচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে এটাও একটা কাজ, সূক্ষ্ম নেশার অনুভূতিও যেন আছে। এত বিশাল কর্মযজ্ঞ, তপু খেই হারিয়ে ফেলল, মনে হলো গোটা পৃথিবীটাই এখানে ঠাঁই পেয়েছে। হঠাৎ সে চমকে লক্ষ করল, কোথা থেকে একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে, কর্মীসংঘের এই ভবনে যা কল্পনাতীত। কাছাকাছি একটা ভেজানো দরজা, শব্দটা কি দরজার ওপার থেকে আসছে? এক মুহূর্ত তপু অপেক্ষা করল, তারপর হাতলে চাপ দিয়ে দরজাটা খুলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। অন্য ঘরগুলোর মতো এটাও বিশাল, টেবিল-চেয়ার নেই, তার বদলে সার-সার খাট, হাসপাতালে যেমন ছোট ছোট লোহার খাট দেখেছে, সে-রকম। খাটে সাদা চাদরে গা ঢেকে শোয়া অনেকগুলো যন্ত্রণাকাতর মানুষ। দরজা খোলার সাথে সাথে সম্মিলিত গোঙানির আওয়াজ প্রকট হয়ে কানে ঝাপটা মারল। মাত্র ক'টা মুহূর্ত, তপু দরজা ঠেলে সরে দাঁড়াল।

পরদিন প্রৌঢ়ের ঘরে ডাক পড়তে তপু ছুটল। মুখোমুখি বসামাত্র মনে হলো অনেক ব্যাপারেই তার কথা বলা দরকার। কোনটা রেখে কোনটা বলে, ভাবতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলল। প্রৌঢ় চোখ তুলে তাকাতে সে বেফাঁস বলে উঠল, এখানে হাসপাতাল কেন?

প্রৌঢ় কথাটা বুঝতে পারলেন না। ফ্যাকাশে চেহারায় শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠতে তপু প্রশ্নটা আবার ছুড়ল। পরমুহূর্তে তার মনে পড়ল, সে ওখানে পা টিপে চোরের মতো গিয়েছিল। এ জন্যই কি তিনি তাকে আমল দিচ্ছেন না?

কিন্তু প্রৌঢ়ের হাবভাব তেমন মনে হলো না। শূন্য দৃষ্টিটুকু তিনি তেমনি ধরে রাখলেন, তারপর স্বগতোক্তির গলায় বললেন, হাসপাতাল কেন হবে? ওরা তো ফ্রেশ রিক্রুটস।

—ফ্রেশ...

প্রৌঢ় ঘাড় নাড়লেন।

—আমার মতো?

প্রৌঢ় আবার ঘাড় নাড়লেন।

—আমাকেও ওখানে যেতে হবে?

—সবাই যায়, আমাকেও যেতে হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত তপু কথা বলতে পারল না। চোখ তুলে সে মুখোমুখি তাকাল। ফ্যাকাশে চোখেমুখে বিষণ্নতা। এত বিষণ্ন, এত বিষণ্ন, তার মনে হলো চিমটি কেটে বিষণ্নতা তুলে আনা যাবে।

—কিন্তু হাসপাতাল কেন? তপু আবার আগের প্রশ্নে ফিরে গেল।

—হাসপাতাল কে বলল?

—ওরা কি অসুস্থ?

—তা কেন হবে?

—আমাকে ওখানে যেতে হবে? আমি অসুস্থ?

প্রৌঢ় চুপ করে থাকলেন। চেহারা কাঠকাঠ, ভাবলেশহীন। তপু দেখল এ চেহারায় কোনো ভঙ্গি নেই। ভঙ্গিহীন, অভিব্যক্তিহীন ঠোঁট চোয়াল চিবুক। ভারী কাচের আড়ালে পাথুরের চোখ। তাকিয়ে তার অস্বস্তি হতে লাগল। মনে হলো সত্যিই সে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

পঞ্চম দিনে তপুকে ডেকে নেয়া হলো সাদামাটা একটা ঘরে। হাসপাতালের ব্যাপারটা মাথায় থাকায় সে অপেক্ষায় ছিল, যখন-তখন ডাক আসবে। তবে এ ঘরে যখন তাকে এনে বসানো হলো, সে ঠিক আন্দাজ করতে পারল না কী ঘটবে? পরনে ঢিলেঢালা ডাক্তারি এপ্রোন নেই, তবু ডাক্তার ভদ্রলোককে তপু ঠিক শনাক্ত করল। বুকে স্টেথো চেপে তিনি জোরে কাশতে বললেন। উলঙ্গ হতে বলায় তপু বিব্রত হলো।

উঁচু, লম্বা টেবিলে চিৎ হয়ে শুয়ে তপু নিজেকে ছেড়ে দিল। উন্মুক্ত নিম্নাঙ্গে হাতের চাপ দিয়ে ডাক্তার জানতে চাইলেন, যৌন অভিজ্ঞতা আছে? প্রশ্নটা তপু খেয়াল করতে পারল না। তিনি তখন ভেঙে সহয করে বললেন, এ্যানি এ্যক্সপিরিয়েন্স অব সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স? তপু মাথা নেড়ে 'না' জানাতে ডাক্তারের হাত থমকে গেল।

কাটাছেঁড়ার কাজটা ডাক্তার খুব যত্নের সাথে করলেন। অপ্রাসঙ্গিক দুটো মাংস গোলক দক্ষতার সাথে বিচ্ছিন্ন করে নিপুণ হাতে সেলাই করলেন। তপু টের পেল না। কাস্ট্রেশন চেম্বারের ছিমছাম বিছানায় সাদা চাদরে গলা পর্যন্ত ঢেকে ঘুমিয়ে পড়ল।

শেষ রাতের দিকে ঘুম ভাঙতে গোঙানির আওয়াজ এল কানে। এপাশে-ওপাশে সার-সার খাট। এটা সেই হাসপাতাল, তপু নিশ্চিত। নিম্নাঙ্গ জুড়ে তীব্র যন্ত্রণার অনুভূতিটা প্রথমেই মনে এল। হাতে ছুঁয়ে অনুভব করল চাদরের নিচে জামাকাপড়হীন উলঙ্গ শরীরে যন্ত্রণার ধারালো বোধটুকু ছাড়া আর কিছু নেই। চিৎকার করতে চাইল তপু, আওয়াজটা নিজের মনে হলো না, ঘড়ঘড় বিকৃত গোঙানিতে রূপ নিল। অবিকল সেই আওয়াজ, যা কয়েক দিন আগে তাকে দরজা খুলতে কৌতূহলী করেছিল। যতই সে গলা চড়াতে চাইল, ক্ষোভে-দুঃখে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইল, গলা বেয়ে একই গোঙানির আওয়াজ বেরুল। আওয়াজটা তার একক কণ্ঠের থাকল না, আশপাশের সব ক'টা খাট থেকে একই আওয়াজ ওঠে এল। সম্মিলিত কোলাহলে তপু নিজের কণ্ঠ হারিয়ে ফেলল।

হাসপাতালের মতো ঘরটায় চার দিন কাটাল তপু। অধিকাংশ সময় ঘুমের ঘোর চোখে। জেগে উঠামাত্র অঙ্গছেদের যন্ত্রণা শরীর জুড়ে পাক খেয়ে খেয়ে গলা দিয়ে সেই গোঙানির আওয়াজই সঞ্চার করল। এই চার দিন কয়েকটা বিষয় তপু লক্ষ করল। অতীতের ঘটনা, স্মৃতি, ব্যর্থতা তাকে নাড়া দিচ্ছে না। বাবা-মা'র কথা তেমন মনে পড়ছে না, রত্নার কথাও না। আর আশ্চর্য, এজন্য অনুতাপও হচ্ছে না।

বাসায় ফিরে তপু দেখল কারো ভেতরে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সবই আগের মতো চলছে। আহমদ হোসেনের বাড়াবাড়ি (যা এ কয়দিনে আদিখ্যেতা ছাড়া কিছু মনে হলো না), মা-রিনি-মিনির উচ্ছ্বাস, রাজীবের নিভৃতাচরণ। কোথাও পরিবর্তনের আঁচড় পড়েনি।

নিজের শরীরের সংগোপন পরিবর্তনটুকু নিরিবিলিতে দেখতে গিয়ে তপু বারবার হোঁচট খেল। ক্ষোভ কষ্ট যন্ত্রণার সমবেত অনুভূতি শরীর-মনে আন্দোলিত হলো, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেই বিচিত্র গোঙানির উপস্থিতিই কণ্ঠে স্থায়ী হয়ে থাকল।

প্রৌঢ় এই প্রথম নিজেকে অবারিত করলেন। গলায় কৈফিয়ৎ-এর ঢঙ নেই; স্বাভাবিক কণ্ঠে, ফ্যাকাশে চোখমুখে অভিব্যক্তির ছায়া না ফেলে বললেন— কাস্ট্রেশনের ব্যাপারটা প্রিমিটিভ, সব প্রিমিটিভ আচারের মতো এটাও ক্রুড। ষাঁড়কে বলদ, কিংবা পাঁঠাকে খাসি করা হতো মানুষের প্রয়োজনে। আজও করা হয়, স্বার্থের প্রয়োজনে। কিন্তু আজকাল মানুষ

নিজেকে কাস্ট্রেট করছে প্রতিনিয়ত– অফিস, সংসার, ব্যবসা, রাজনীতি, ধর্মবিশ্বাস– সবখানে। উপায় নেই, মানুষ নিজের স্বার্থেই বন্দি হচ্ছে, বিশেষ করে এস্টাবলিশমেন্টের। ম্যেন্টাল কাস্ট্রেশন। আমরা এখানে ফিজিক্যালি কাজটা করে ফেলি, এতে কমিটমেন্টে কোনো ফাঁক থাকে না।

প্রৌঢ়ের বলার ভঙ্গিতে আন্তরিকতা ছিল। তপু শুনল, শোনামাত্র হু হু হাওয়া ঝটপট করে উঠল ভেতরে। গলা দিয়ে গোঙানির ধ্বনিটা অজান্তেই বেরিয়ে এল।

ধীরে ধীরে তপু অভ্যস্ত হয়ে উঠল। আয়নায় নিজের কাঠকাঠ চেহরা (আগের চেহারাটা মনে পড়ে না), সকাল বেলা দাঁত মাজার সময় ঠোঁট চোয়াল চিবুকের যা–কিছু ভাঙচুর, ঘুম বলতে নিখাদ ঘুম, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের জটাজালহীন মাথাটা খুব নির্ভার।

রত্নার মুখটা অভিযোগঠাসা। তপুকে টানে না সে মুখ। রত্নাকে সে কী বলবে! তার ভয় হয়, কথার বদলে গলা দিয়ে সেই গোঙানিটা বেরিয়ে পড়বে। নিজের অনিচ্ছুক, নিরাসক্ত হাত রত্নার কাঁধে রাখতে রত্না চমকে হাতটা সরিয়ে দেয়। বরফঠাণ্ডা স্পর্শে তার চোখেমুখে ভয়, ভয়।

পেছনের দরজার বিষয়ে তপুর কৌতূহল নেই। তার মনে হয় ঢোকার পথ সামনে পেছনে যেকোনো দিকেই হতে পারে। বেলুন-রমণীরা মাঝে মাঝে বিভ্রান্তিতে ফেলে। একদিন সে জটও খোলে। আদতে ওগুলো বেলুনই, ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে পরতে হয়, বাতাস কমে গেলে যেই সেই, রবারের বেলুন।

বহু বছর কেটে গেছে। কর্মীসংঘের ভবন তেমনি আছে। তপু নামটা এতদিনে বেমানান। তরুণ বয়স পেরিয়ে সে এখন রীতিমতো প্রৌঢ়। রত্না তার স্ত্রী হয়েই আছে। নিরানন্দ কাটে বলে রত্নাকে বেলুন জোগাড় করে দিতে হয়েছে। ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে যখন পরে, একটুখানি উদ্দীপনা জাগে। প্রৌঢ় বিদায় নিয়েছেন অনেক দিন। তার জায়গায় দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ অনেক প্রৌঢ় এসেছেন। তারপর তপু নিজেও যখন প্রৌঢ়, তার জায়গা হয়েছে প্রথম-প্রৌঢ়ের ঘরে। প্রথম–প্রৌঢ়ের কথা বেশ মনে পড়ে। আয়নায় তাকালে প্রথম-প্রৌঢ়ের মুখটাই ভাসে। ভারী কাচের আড়ালে চোখ দুটো পাথুরে, হাঁটার সময় ডান পা অল্প খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয় বলে অসমান কাঁধ জুড়ে মৃদু ওঠানামা।

একদিন বছর ছাব্বিশ-সাতাশের এক তরুণকে নিয়ে আসা হলো। চোখেমুখে কৌতূহল। চেহারার এই ভঙ্গিটা তপুর চেনা। তরুণ বসল। বসে সামনে একটা কার্ড বাড়িয়ে ধরল। এটি আরো বেশি চেনা। র‍্যাক থেকে একটা ফোল্ডার খুলে তপু পড়তে শুরু করল: তপন হায়দার, এজ টুয়েন্টি সেভেন...। তপন হায়দার? ফাইভ ফিট নাইন এন্ড হাফ, ব্ল্যাক মোল অন রাইট আর্ম। তপু নিজের ডান হাতের কনুইয়ের ওপর চোখ রাখল, জড়ুলটা এত দিনে রং মরে ফ্যাকাশে বাদামি। চেস্ট থারটিসেভেন, ননস্মোকিং, এক্সপেকটেড সেলারি... কিছু নেই। তপন হায়দার?

মুখোমুখি বসা তরুণ সলজ্জ হাসল। তপু চমকাল, বিশ-বাইশ বছর আগে আয়নায় দেখা মুখ। সেই চোখ, নাক, ঠোঁট। কেবল দৃষ্টিটা বড় স্বচ্ছ, সংশয় নেই।

কথা বলতে গিয়ে তপু হোঁচট খেল। দীর্ঘদিন এমন অভিজ্ঞতা হয়নি, কী রকম বিচলিত মনে হচ্ছে নিজেকে, যা তার বর্তমান শারীরিক-মানসিক অবস্থায় ঘোরতর বেমানান।

বিচলিত অবস্থা থেকে তরুণ রক্ষা করল, বলল, আমার কোনো দোটানা নেই, পিছুটান নেই, আমি প্রস্তুত।

এমন তো কেউ বলে না। প্রথম-তপুর খটকা লাগল, দ্বিতীয়-তপু নতুন কথা বলছে। যেন এখনই তৈরি, ছুরি-কাঁচির নিচে ভারমুক্ত হতে চায়। যেন ব্যাপারটা কৌতুককর, আগ্রহেরও। কিন্তু বিশ-বাইশ বছর, হতে পারে তারও আগে আয়নায় দেখা মুখটার দিকে তাকিয়ে প্রথম-তপুর অন্য কথা মনে হলো, এমনও তো হতে পারে, বিশ-বাইশ বছর আগে খোয়া-যাওয়া সম্ভাবনাকে ফিরিয়ে নিতে চায় দ্বিতীয়-তপু, বানচাল করতে চায় সব। হতে পারে বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, দুষ্কৃতি। বিশ-বাইশ বছর আগেকার নিজের পরিস্থিতির সাথে এর কত তফাৎ!

–রত্না কোথায়? প্রথম-তপু জিজ্ঞেস করে।

–রত্না? বোঝা যায়, এ নামে কাউকে চেনে না দ্বিতীয়-তপু।

–রাজীব?

–ওহ্ দাদা– আত্মহত্যা করেছে।

–আর?

–রিনি-মিনি আপাতত বেলুন পেয়ে খুশি।

—আর?

—আর?

—আহমদ হোসেন, তসলিমা খাতুন?

—আজকাল ঘ্যানঘ্যান কম করে। আমার সাফল্যে দু'জন খুশি।

আত্মবিশ্বাসী তরুণকে নিয়ে তপু ঘর থেকে বেরোয়। বিশ-বাইশ বছর কিংবা আরো আগের সেই পুরোনো ছবি। সার-সার ভেজানো দরজা, ডানে-বামে বাঁক খাওয়া করিডোরের গোলকধাঁধা। প্রথম-তপুর ভয় হয় পেছন থেকে তরুণ তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবে। অল্প সময়ের মধ্যেই চারপাশে গোলকধাঁধার ব্যাপারটা তরুণের মনে গেঁথে বসে। তাকে কিছুটা বিভ্রান্ত দেখায়। ডানে-বামে অসংখ্য বাঁক পেরিয়ে একটা দরজার মুখে প্রথম-তপু থামে। পেছন-পেছন দ্বিতীয়। সাদামাটা লিফটের দরজার মতো দরজা, কাচবসানো হলেও ভেতরে আলো নেই বলে অন্ধকার। তরুণকে তপু এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করে। তরুণ এগোয়, দুই পা বাড়িয়ে দরজা খুলে ভেতরে ডান পা-টা বাড়ায়, তল পায় না, পা ডুবে যেতে থাকে, যেন পাঁকে গেঁথে যাচ্ছে গোড়ালি-হাঁটু-উরু, বেঁকে যাওয়া কোমরের ডান পাশ। বাঁ পায়ে ভর রেখে সে শরীরটা খাড়া করতে, টেনে তুলতে চেষ্টা করে। যন্ত্রণা, কষ্ট, আর সেই সাথে দুর্মর সাহসের, শক্তির একটা গতিচঞ্চল ঘূর্ণি ঝক্‌মকিয়ে ওঠে। — আর আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় শরীরকে সাপের মতো বাঁকিয়ে বাঁ পায়ের ওপর প্রায় খাড়া করার উপক্রম করে। আধখোলা দরজায় প্রথম-তপু হাত রাখে, এক মুহূর্ত দ্বিধা করে, তারপর এক ধাক্কায় দরজাটা বন্ধ করে দেয়। বন্ধ দরজার ওপারে, তলকুঠুরির ভেতর পতনের আওয়াজটা ভোঁতা আর সুদূর।

কত কাল হয়ে গেল! দোটানা-টা যাই-যাই করেও যাচ্ছে না।

গর্তসন্ধান

ঘনঘন ম্যানহোলের ঢাকনি চুরি ঠেকাতে, কয়েক রাতের পাহারায় একজন ঢাকনিচোর ধরা পড়তে লেকসার্কাস ডলফিন গলির দি নিউ আল-মদিনা সুপার ড্রাই ক্লিনার্সের সামনের ল্যাম্পপোস্টে একটা ঘোষণা ঝোলানো হয়েছিল: এখানে ম্যানহোলচোরকে উত্তমরূপে ধোলাই করা হয়। নিচে চক দিয়ে বা পান খাওয়া হাতের চুন দিয়ে ফুটনোট: ফ্রি ডেলিভারি। (আস্তো ম্যানহোলের ওপর চোরদের লোভ-লালসা থাকার কথা নয়, তার পরও ম্যানহোলচোর কথাটা বসানোর সময় এমন সন্দেহ কাজ করতে পারে— চোরদের বিশ্বাস কী, শুধু লোহার ঢাকনি কেন, গোটা ম্যানহোলও হাওয়া করে দিতে পারে!)

কয়েক দিন পর ছুটির দিন ভোরবেলা, ডলফিন গলি থেকে সংসদ ভবন, আবার সংসদ-টু-ডলফিন মর্নিংওয়াক শেষে মদিনা সুপার ড্রাই ক্লিনার্সের সামনে ছোটখাটো ভিড় দেখে মাহমুদ ফিক করে হেসে ফেলে। তার পঁয়তাল্লিশ বছরের গোলগাল শরীরে, ভারী চশমায়, ফাঁপানো গালে হাসিটা মানানসই হয় না। তার পরও ঠোঁট-চিবুক-দাঁতের সম্মিলিত

তৎপরতায় মুখভঙ্গিটা শরীর মনে উষ্ণ-ঠাণ্ডা, ঝিরিঝিরি আমেজ ছড়ায়। পরমুহূর্তেই দিনটা ছুটির, অকাজের– বিবিসি, স্টার স্পোর্টস, ঝাল মুরগি, ভরদুপুরের বিছানা, ঘুম না নাসরীন, নাসরীন না ঘুম এসব মাথার আনাচেকানাচে হুটোপুটি জুড়ে দিলে হাসিটা ফ্যালনা হয়ে যায় না।

ঘাড় ঘুরিয়ে মাহমুদ যাকে দেখে, তিনিও হাসছেন। জটলার দিকে মুখ, তবে ফিকফিক হাসি না, হো হো। অবাক হতে হয়, ইনি পথেঘাটে হেসে ফেলার লোক নন। একটু দূরে গলির মাথাটা যেখানে দু-দিকে নব্বুই ডিগ্রিতে ভাগাভাগি হয়ে ঠিকানা-খোঁজা লোকজনকে হঠাৎ করে ধাঁধায় ফেলে মজা পায়, সেখানে দক্ষিণমুখী ব্যালকনি ছড়ানো বাড়িটা তার 'শান্তির নীড়'। গেটের পিলারে শান্তির নীড়ের তালব্য শ অস্পষ্ট হয়ে গেলেও শান্তি বিঘ্নিত হয়নি, কারণ অপর পিলারে কুকুর হইতে সাবধান-এর বদলে এ্যালসেশিয়ানের কান-ঝোলা সুবোধ মুখ, নিচে মার্বেল প্লেটে জি এম হান্নান, জয়েন্ট রেজিস্ট্রার অবঃ। কুকুরের মুখের নিচে মানুষের নাম নিয়ে ডলফিন গলিতে কানাঘুষা কম হয়নি। তবে এ মুহূর্তে জয়েন্ট রেজিস্ট্রার অবঃকে হাসতে দেখে অবাক হওয়ার পাশাপাশি মাহমুদ আশ্বস্তও হয়। এই ভোরবেলা হাসির প্রেরণাটা তার একার ওপরই ভর করেনি।

কিন্তু যে-কারণে হাসি, তার সাথে বাস্তব ঘটনার যোগাযোগ নেই। কারণ গত রাতে ডলফিন গলিতে ম্যানহোলের ঢাকনি খোয়া যায়নি। অন্যদিকে ঢাকনিচোরের পরিবর্তে পাড়ার ভলান্টিয়ার যুবসমাজ যাকে ঘিরে জটলা পাকাচ্ছে, সে একজন দুধঅলা। পাটীগণিতের অসাধু গোয়ালা। খুব ভোরবেলা ডলফিন গলির ওপারে, ধানমণ্ডি লেকের হাঁটুপানিতে উবু হয়ে লোকটা মন দিয়ে দুধের লাল রঙা প্লাস্টিকের বালতিতে আবর্জনাময় দুর্গন্ধ পানি ভেজাল দিচ্ছিল। কাজটা করার সময় তার মধ্যে কোনো বিকার লক্ষ করা যায়নি, দিনের প্রথম আলো, রাস্তার পথচারি কিংবা দুর্গন্ধময় বিষাক্ত পানি কিছুই তার ওপর ক্রিয়া করছিল না।

এমন অবস্থায় দিনের আলো এবং দূষিত পানির পটভূমিতে তাকে ধরে কোমরে দড়ি বেঁধে আনা ছাড়া উপায় কী ছিল! কিন্তু দড়িবাঁধা অবস্থায় ভয়ংকর পরিণাম সামনে নিয়েও তার তেমন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বলে মনে হয় না। এপর্যায়ে ঘিরে ধরা জটলা ধাপে ধাপে তার ওপর চড়াও হয়। তোর নাম কী? প্রশ্ন শুনে সে উদাস হয়। নামের প্রসঙ্গ অবান্তর প্রমাণ করতে কোমরে নারকেল ছোবড়ার দড়িতে আঙুল চালায়। প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হতে তার চেহারায় পরিষ্কার বিরক্তির চিহ্ন ফোটে এবং সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ঘাড় বরাবর মাঝারি খোঁচা পড়ে। খোঁচা খাওয়ামাত্র সে ঘাড় বাঁকিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে, গুতান ক্যান? নামে কাম কী! একটা থাপ্পড় পড়ে গালে এবং পাতানো গালে পাঁচ আঙুলের জুতসই সংযোগে মনোমুগ্ধকর চড়াৎ আওয়াজ ওঠে। পরপরই দুটো ঘুষি, একটা আনাড়ি লাথি। নাকের বাম পাশে দেখতে না দেখতে লালচে বিন্দু টকটকে রূপ নিয়ে দুই ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত গুটিগুটি গড়ায়।

নাম?

আবদুল করিম।

বাপের নাম?

আবদুর রহিম।

বাড়ি?

কামরাঙিরচর।

আবদুল করিম সংক্ষেপে যা বলে, তা এ রকম: কামরাঙিরচরে তার টিনের দোচালা বাড়িতে সে তার পরিবার মিলে দুটো সিন্ধী গাই পালে। ভরণপোষণের বিনিময়ে গাই দুটো দৈনিক পনেরো লিটার খাঁটি দুধ দেয়। এই দুধ আবদুল করিম আর তার দুই ভাই মিলে শহরের কয়েকটা এলাকায় খাঁটি দুধ-পিপাসু গ্রাহকের বাড়ি বাড়ি নিয়ে যায়, তবে কোনো দিন যদি পাকিস্তানি গাইগুলো মাপ মতো দুধ দিতে গড়িমসি করে, তো ওয়াসার টেপে, বৃষ্টির পানিতে, ধানমণ্ডি লেকের মতো অভিজাত লেকে দুধের পরিমাণটা ঠিকঠাক করে নেয়। কাজটা তার আগে তার বাবা আবদুর রহিম করেছে, বাবার বাবা দাদা করেছে, দাদার বাবা করেছে।

এমন প্রাঞ্জল বিবরণের পর আবদুল করিমকে নতুন কিছু জিজ্ঞাসা করার দরকার পড়ে না। কিন্তু গোল হয়ে ছেঁকে ধরা মাথাগুলো এই সংক্ষিপ্ত, অতিসরল বিবরণে আস্থা রাখতে পারে না। তাদের চোখমুখে জিজ্ঞাসু ভঙ্গি ফোঁস ফোঁস ফণা তোলে। লোকটা নির্ঘাৎ গাঁজাখোর, গাঁজা খেয়ে রূপকথা শোনাচ্ছে। দুধ ও পানি (খাল-বিল-বাঁওড়-ধানমণ্ডি লেক, যে-জায়গারই হোক) দ্রব্য দুটি তাদের দৃষ্টিতে কিছুতেই সহাবস্থান করতে পারে না। দুধ ও পানি একে অপরের কাছাকাছি আসতে পারে, একাত্ম হয়ে মিশে যেতে পারে এমন কথা বাপের জন্মেও তারা শোনেনি। বৃষ্টির পানির ধাক্কাটা না হয়

সামলানো গেল। কিন্তু ওয়াসার পানি? খাওয়ামাত্র রক্তে বেলরুবিন বেড়ে জগৎ-সংসারের রং-রূপ হলুদ, সর্ষে খেত। চিত হয়ে শুয়ে কড়িবর্গা গোনো, জাউ খাও, আখ খাও। আর ধানমণ্ডি লেকের পানি? পেটে গেলে কী হতে পারে, এ নিয়ে কারো ঝাপসা ধারণাও নেই। ভিডি, এইডস হওয়াও কি বিচিত্র? মোটা কথা, সময় গড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে অল্পবয়সীদের সাথে বড়রাও যোগ দিয়ে সাত-পাঁচ নানা কিছু ভাবতে গিয় পরিস্থিতি জঠিল করে তোলে। কোনো সিদ্ধান্তে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

কিন্তু আবদুল করিমের জবানি সত্য, দিনের প্রথম আলো ফোটার মুহূর্তে তাকে লেকের হাঁটুপানিতে উবু হয়ে একমনে দুধ-পানি এক করতে দেখা গেছে। এ পর্যায়ে অবিশ্বাস্য ঘটনার সত্যতায় জটলায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে, রাগে কারো কারো গা কাঁপে। লোকটাকে কী করা উচিত, এ নিয়ে উচ্চস্বরে মতামত বিনিময় চলে। অতি উৎসাহী তরুণরা তার গা থেকে আলগোছে চামড়া খুলে ফেলতে আগ্রহী। তবে কাজটা বলা সহজ, করে দেখানো সহজ নয়। কারণ ডলফিন গলির অতি অভিজ্ঞ কসাই হামদু, যে দিনে অন্তত বারোটা গরু-খাসির চামড়া ছিলে স্তূপাকারে করে ফেলে, তার পক্ষেও বলা শক্ত, মানুষের চামড়া ছুরি ও হাতের ছোঁয়ায় তরতরিয়ে খুলে আসবে, নাকি ফটাস করে ছিঁড়ে ঝুলে থাকবে। কারো কারো মতে, লোকটাকে ডলফিন গলির যেকোনো খোলা ম্যানহোলে হাত-পা বেঁধে ছেড়ে দেওয়াই সঙ্গত।

মতামতগুলো আবদুল করিমের মনে কি প্রতিক্রিয়া করে বলা কঠিন। কোমরে দড়িটার কারণে তার অস্বস্তি হচ্ছে বোঝা যায়, একটু পরপর দড়ির গিঁটে সে হাত ছোঁয়াচ্ছে। নাকের বাম পাশে রক্তের চিকন ধারাটা স্থির হয়ে বসে গেছে, ওপরের ঠোঁটটা অল্প ফুলে চেহারাটা অভিমানী, বিষণ্ন, উদাস।

জয়েন্ট রেজিস্ট্রার অবঃ বাড়ি ফেরার পথে ভাবেন লোকগুলো গরু, আবদুল করিমের পাকিস্তানি গরুগুলোরও অধম। কী করে মারবে, এ পরিকল্পনাটাও করতে পারছে না। দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তিনি পরিষ্কার দেখতে পান গরুগুলো আগড়মবাগড়ম বকবক করছে। দেখে হাত দুটো শিরশির করে। শোবার ঘরের স্টিল ক্যাবিনেট থেকে ডবল ব্যারেল ওয়েব্লি এন্ড স্কট হাতে আবার ব্যালকনিতে দাঁড়ান, ধীরেসুস্থে দুই ব্যারেলে দুটো ইলি কার্ট্রিজ ভরে ভিড়ের মাঝখানে আবদুল করিমের বুকের বাম পাশে হার্ট বরাবর তাক করেন। এ্যাঙ্গলটা চমৎকার, লোভ হয়। গু... ডু...ম শব্দে জয়েন্ট রেজিস্ট্রার অবঃ পুব আকাশ ফুটো করে ফেলেন। দ্বিতীয়বার গুলি ছোড়েন ঘুরে দাঁড়িয়ে পশ্চিম আকাশে।

ম্যানহোলচোর ধরা পড়ার পর দ্বিতীয় দফায় ডলফিন গলি মেতে ওঠে। গুলির ঘটনায় প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও লোকজন যখন দেখে লক্ষ্যবস্তু পুব এবং পশ্চিম আকাশ, তারা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। গলিতে ভিড় বাড়ে। রিকশা, বেবিট্যাক্সি জ্যামে আটকা পড়ে। বালুবোঝাই দুটো আন্তঃজেলা-সমগ্র-বাংলাদেশ বেদম হর্ন টিপে পরিস্থিতি আরো সরগরম করে তোলে। লোকজন যারা পথ ধরে যায় আসে, তারা না থেমে পারে না। নতুন ম্যানহোলচোর ভেবে উঁকি মেরে তাজ্জব হয়ে যায়, লেকের পানি! কারো কারো পক্ষে কৌতূহল সত্ত্বেও ভিড় ঠেঙিয়ে ভেতরে সেঁধুনো সম্ভব হয় না, তারা নিরীহ প্রশ্ন কওে, কী ভাই এখানে? জবাব আসে, লেকের পানি। লেকের পানি?

গুলির শব্দ যে একটা প্রতিক্রিয়া ফেলতে পেরেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। লোকটাকে একটু দূরে রাস্তা লাগোয়া প্রাক্তন বামপন্থী বিরোধীদলীয় নেতার চারতলা কড়া লাল ইটের বাড়ির সামনের ল্যাম্পপোস্টে টাইট করে বাঁধা হয়। এ জায়গাটা তুলনামূলক ভাবে চওড়া, জনসমাগমের জন্য সুবিধের, তবে নিউট্রাল নয়। সরকারদলীয় কিছু তরুণ আপত্তি তোলে, কিন্তু এর চেয়ে সুবিধেজনক ভেন্যু না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে তারা ব্যবস্থাটা মেনে নেয়। বিরোধীদলীয়রা এই উপরি পাওনাকে খুব উপভোগ করে। ঘটনাটা তাদের কাছে রাজনৈতিক দিক দিয়ে বেশ সম্ভাবনাময় মনে হয়।

স্থান পরিবর্তনের পর আবদুল করিম গোয়ালকে চিন্তিত মনে হয়, ভয় পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে, তবে অনুশোচনার ছাপ তার মধ্যে নেই। বরং ফোলা ঠোঁটের অভিমানী ভঙ্গিটা এখন খুঁটিয়ে দেখলে মনে হবে অভিমান নয়, রাগ। এ পর্যায়ে তার ওপর সৃশৃঙ্খল অভিযান শুরু হয়। আনাড়ি, বোকাসোকা লোকজনের ঝোঁক বেশি। জীবনে কোনো দিন মারপিট করেনি বলে নিজেদের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করার সুযোগ তারা আগেভাগে নেয়। কেউ এসে চুল ধরে এমনভাবে টানে যেন ঢাকনি খুলে মাথার ভেতরটা দেখবে, কারো শখ কান মোচড়ানোয়। এ অবস্থায় কয়েকজন এক সাথে যোগ দিলে আবদুল করিম মুখ-ভর্তি থুতুতে দু'তিনজনকে আচমকা ঘায়েল করে ফেলে। আকস্মিক ঘটনায় জনতা খেপে ওঠে, আবার যারা থুতু খেয়ে শার্টে পাঞ্জাবিতে গামছায় রুমালে মুখ লুকাতে ব্যস্ত, তাদের নিয়ে ঠাট্টা-টিটকারিতেও মেতে ওঠে।

জনসমাগমের গন্ধ শুঁকে সদর রাস্তা ছেড়ে দুজন পুলিশ এসে হাজির হয় এবং স্রেফ বাঁশি বাজিয়ে ভিড় ফাঁকা করে সামনে এগোয়। ঘটনা শুনে পুলিশ দু'জন একে অন্যকে দেখে, ভ্রূ কোঁচকায়। দু'জনের মধ্যে রোগাজন হাতের চিকন বেত তুলে সাঁই করে আবদুল করিমের ডান কানে বসিয়ে দিতে, সে কানে হাত চেপে উরি আল্লারে বলে চিল্লিয়ে ওঠে। দুজন এবার জেরা করে, খানকির পুত, দুধে পানি দিছস? বেতের বাড়ি খাওয়া কান মোচড়াতে মোচড়াতে আবদুল করিম মাথা

নেড়ে জানায়, দিয়েছে। পুলিশেরা আবার একে অন্যকে দেখে। রোগাজন জোরালো গলায় জনতার কাছে জানতে চায়, আলামত কই? আলামতের খোঁজ করে হতাশ হতে হয়, প্লাস্টিকের লাল বালতিটা ধারে-কাছে কোথাও নেই। পুলিশেরা নাছোড়, আলামত তাদের চাই। কিসের পানি– টেপের, না ধানমণ্ডি লেকের, না অন্য কিছুর– পরীক্ষা করতে দুধটা চাই। এ পর্যায়ে আবদুল করিম খোয়া-যাওয়া দুধ সমেত বালতির শোকে গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে।

মর্নিংওয়াক সেরে অন্য দিনের তুলনায় মাহমুদ দেরি করে ফেরে। নাশতার টেবিলে বসতে বসতে স্ত্রী নাসরীনকে বলে, ঢাকা শহরে গোয়ালা আছে জানো? ছুটির দিনের হেঁয়ালি ধরতে নাসরীন ভ্রূ কোঁচকায়, থাকবে না কেন? এ পাড়ায়ই তো একটা আস্ত ডেয়ারি। মাহমুদ রহস্য করে, আরে ডেয়ারি না, গোয়ালা। বহুদিন পর একজন খাঁটি গোয়ালা দেখলাম। দশ বছরের মেয়ে সোমা বলে, গোয়ালা কী করে? প্লেটে লুচি, বেগুন ভাজি নিতে নিতে টেবিলের মাঝবরাবর মিহি স্তর পড়া ধ্যানমগ্ন পায়েশের বাটিটা মাহমুদ লক্ষ না করে পারে না, এবং মুহূর্তেই ঘন দুধের ধ্যানী আড়ষ্টতা থেকে একটা চঞ্চল হাতছানি তাকে অস্থির করে তোলে। বাটিটা কাছে টানতে গিয়ে টের পায় তার হাতের আঙুলে, ঝুঁকে-পড়া মুখের উৎসুক জিভে লজ্জা, লজ্জা। অবস্থা সামাল দিতে মেয়ের প্রশ্নের উত্তর দেয়, গোয়ালা দুধে পানি মেশায়।

সত্যি দুধে পানি দেয়?

অবশ্যই।

কী বুদ্ধি! আমি দেখব।

গোড়াতে আবদুল করিমের কাছে ব্যাপারটা ইয়ার্কির মতো লাগছিল। এমনকী কোমরে দড়ি পরিয়ে যখন চার-পাঁচটা সবে গোঁফ-গজানো ছেলেপেলে তাকে লেকের ঢালু থেকে টেনে উপরে ওঠাচ্ছিল, ইয়ার্কি-আচ্ছন্ন ভাবটা পুরোপুরি তাকে ছেড়ে যায়নি। ছেলেগুলো তার সাথে রসিকতা করছিল, তাঁর নিজেরও ইচ্ছে করছিল পাল্টা রসিকতা করে। কিন্তু অবস্থা এত দ্রুত পাল্টাছিল, সে ভেবে পাচ্ছিল না এরা কী চায়? অল্প সময়েই সে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল এরা তামাশা করছে না, কিন্তু কী চায়? তার রাগ বাড়ছিল। শরীরে মার পাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষোভে, বিদ্রোহে ইচ্ছে করছিল সব ক'টাকে শেষ করে দেয়। কিন্তু কোমরে শক্তপোক্ত দড়িটা এমনভাবে তলপেটের নরম মাংসে চাকুর মতো বসে যাচ্ছিল, শেষ করার কোনো কায়দাকানুনই মাথায় খেলছিল না। তারপর যখন হাত দুটোও পিছমোড়া করে চারতলা লাল বাড়িটার সামনের খুঁটিতে টাইট করে বাঁধা হলো, থুতু ছোড়া ছাড়া আর কী করার ছিল! শরীর-ভর্তি রাগ নিয়ে সে লোকগুলোর পাগলামো সহ্য করে। এ অবস্থায় আশপাশে কী হচ্ছে, সে পরিষ্কার খেয়াল করতে পারে না। এমনকী গায়ে এসে পড়া চিকন চ্যাপ্টা মোটা ভারী নানা ওজনের মারগুলোকেও আলাদা করতে পারে না। কিল ঘুষি লাথির প্রতিক্রিয়াগুলো মোটামুটি একরকম– ভোঁতা ভোঁতা। অন্যদিকে পাতলা, মোলায়েম হাতের চড়গুলো এত ধারালো ভাবা যায় না। গালে পড়তে কলাপাতা ছেঁড়ার চ্যাড়াৎ আওয়াজ ওঠে। গুঁতোগুলো আবার আলাদা, বুলেট বেঁধার মতো, এধার ওধার ছেঁদা করে ছাড়ে।

এত ঝামেলার মধ্যেও আবদুল করিমের বোধশক্তির যেটুকু নিভু নিভু কাজ করে, তাতে লোকগুলোর পাগলামিটাই মস্ত ধাঁধার মতো লাগে। এদের মতলবটা কি? শুধু দুধের লোভেই এমন করেছে! এক বালতি দুধ থেকে এতগুলো লোক এক ফোঁটা দুই ফোটা করেও ভাগে পাবে না। শুধু দুধটা মেরে দেয়াই যদি এদের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে অনেক আগেই তাকে ছেড়ে দেয়ার কথা। এখনো এরা খেপে আছে কেন? তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে, যেন মাছবাজারের পকেটমার। পকেটমারের কায়দায়ই তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। তবে আবদুল করিম তাদের কিছু মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। লোকগুলো যখন তাকে ছেঁকে ধরেছিল– নাম, বাপের নাম নিয়ে জেরা করছিল, রাগের মাথায় সে কয়েকটা কথা মিথ্যা বলেছে। প্রথম মিথ্যাটা– সিন্ধী গাই জাতীয় কিছু তার নেই। দুটো চিমসে, হাড্ডিসার খাস্ দেশি গাই থেকে সে আর তার বউ মিলে জবরদস্তিতে লিটার তিনেক দুধ আদায় করে নেয়। বউটা খণ্ডারনি, দুধ নামাতে বসলে ওলানে রক্ত বের করার দশা করে ছাড়ে। দুই নম্বর মিথ্যাটা হলো, কামরাঙিরচর। কামরাঙিরচর কী খেলার কথা! এত পথ ঠেলে দুধে পানি মেশাতে কেউ ধানমণ্ডি লেকে আসে! আহম্মকগুলো এসব বিশ্বাস করেছে।

মিথ্যাগুলো কেন বলেছিল সে বলতে পারবে না। হতে পারে, এমনভাবে আহম্মকগুলো তার ওপর চড়াও হয়েছিল, তেজ দেখাচ্ছিল, আবদুল করিম নিজের অজান্তেই ধরে নিয়েছিল, সে একটা অপরাধ করে ফেলেছে।

সময় গড়াতে, রোদ চড়চড় করে চোখে লাগতে লোকগুলোর পাগলামি ধাপে ধাপে বাড়ে। হাত-পা চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে নাপিত ডেকে তারা তার লম্বা, তেলতেলে কোঁকড়া চুলগুলো চেঁছে দেয়। পয়সা খরচ করে বিক্রমপুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের বাসি ঘোল এনে মোড়ানো মাথায় ঢালে, টক স্বাদের কয়েক ফোঁটা ঘোল কপাল গড়িয়ে ফোলা ঠোঁটে পড়তে, শুকনো জিভ সেটুকু নিমেষে শুঁষে নেয়। কাণ্ড দেখে কেউ কেউ হাততালি দেয়। একজন ঘোলের ভাণ্ড উপুড় করে ঢেলে

দিতে ঠোঁট-জিভের তৎপরতা বাড়ে এবং গড়ানো ধারা যতটা সম্ভব মুখবন্দী করতে দুই ঠোঁটের মাঝ বরাবর আবদুল করিমের আগুয়ান জিভ হিস্ হিস্ আওয়াজ তোলে। শব্দটা ঠিক ঠিক শনাক্ত করতে একজন মাথা বাড়িয়ে এগিয়ে এলে, আবদুল করিম হিস্‌হিসে গলায় বলে, তোগো মায়রে...। শোনামাত্র জটলা আবার উত্তেজিত হতে বাধ্য হয়।

গোবেচারা গোছের যে লোকটা সামনে এগিয়ে গিয়েছিল, তার কালো মুখটা লজ্জায় গাঢ় বেগুনি পোঁচে ছেয়ে যায়। সে কী করবে, ভেবে উঠতে না পেরে ঘাড়-গর্দানের ওপর বেগুনি রঙের বেঢপ মুখ নিয়ে কাঠ-কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার ভয় হয়, নড়াচড়া করলেই বদমাইশটা আবার বলবে। এমন সময় একটা ঘটনা ঘটে। মাথায় ঘোল ঢালার সময় জনতা খেয়াল করেনি ভেজা কাপড়ের বাড়তি ওজনের সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের যোগে আবদুল করিমের চেককাটা কলাপাতা-রং লুঙ্গি একটু একটু করে নিচের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এ মুহূর্তে অদৃশ্য কারসাজির মতো প্যাঁচ খুলে কলাপাতা লুঙ্গি ধীরে ধীরে কোমর ছাড়িয়ে গোপনাঙ্গ অর্গল মুক্ত করে উরু-হাঁটু-টাটু ছাড়িয়ে দুই পায়ের গোড়ালিতে বেড়ির মতো আটকে থাকে। জনতার আক্রোশে বাধা পড়ে। বাধাটা কোথা থেকে আসে, কেনই-বা বাধা, তারা বলতে পারবে না। তবে বাধাটা সত্য। বিমূঢ় ভঙ্গিতে তারা দাঁড়িয়ে থাকে। হিস্ হিসে গলায় আবদুল করিম দ্বিতীয়বার তোগো মায়রে বলে।

ভরদুপুরে ডলফিন গলি কোলাহলশূন্য, স্তিমিত। গলির যারা আদি বাসিন্দা তারা তো বটেই, যারা অন্তত কয়েকটা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা গলিতে কাটিয়েছে, তারাও জানে এ সময়টা একেবারে আলাদা। গলির উঁচ-উঁচু নিম গাছগুলো ঝিরিঝিরি হাওয়া দেয়। রোদের ঝাঁঝ থাকলেও নিম পাতার স্বাস্থ্যকর ঠাণ্ডা সুগন্ধি হাওয়া গলিময় মৃদুমন্দ বয়। গলি ছাড়িয়ে এই হাওয়া দক্ষিণে বশিরউদ্দিন রোড, জিঞ্জিরা হোটেল, গ্রীন রোড, পশ্চিমে মিরপুর রোডের কোলাহলে, ধানমণ্ডি লেকের দুর্গন্ধ পানিতে মেশে।

দিনটা সাপ্তাহিক ছুটির বলে দুপুর নাগাদ ডলফিন গলি ঝিমিয়ে পড়ে। নিম গাছের হাওয়ার সাথে বোল-ধরা আমগাছগুলোও হেলেদুলে পাতা নাড়ায়। এসবের মধ্যে মসজিদ-ফেরত লোকজনের চলাফেরা তেমন চাঞ্চল্য জাগায় না। তবে টুপি পাজামা লুঙ্গি আচকান পাঞ্জাবি ইত্যাকার পোশাকে আমণ্ডু আবৃত শরীরে তারা যখন প্রাক্তন বাম–বর্তমান–ডানপন্থী বিরোধী নেতার বাড়ির সামনের ল্যাম্পপোস্টে হাতবাঁধা, কোমরবাঁধা ন্যাংটো আবদুল করিমকে দেখে, তাদের সুরক্ষিত দেহের আনাচেকানাচে অনিশ্চিত অস্বস্তির সুড়সুড়ি জাগে।

ছুটির দিন দুপুরের অবধারিত ঝাল-মুরগির পর বিছানা এবং নাসরীনের যুগপৎ আকর্ষণ সত্ত্বেও মাহমুদ শোবারঘরের লাগোয়া বারান্দায় পায়চারি করে। বারান্দার গ্রিলে মাথা রেখে ডান দিকে ঘাড় কাত করলে গলির যেটুকু চোখে পড়ে, তাতে বাড়িঘরের কার্নিশে খোঁচা-খোঁচা রোদ, দু-একটা রিকশা-স্কুটার, ভিডিও দোকানের কাচে হিন্দি নায়িকার জ্বলন্ত বুক, পথচারী– এসবের পটভূমিতে ন্যাংটো আবদুল করিমকে মিস্ করা যায় না। ভোরবেলা মর্নিংওয়াক সেরে দি নিউ আল মদিনা ড্রাই ক্লিনার্সের সামনে জটলা দেখে অজান্তে ফিক করে হেসে ফেলার পর, এই এত বেলা পর্যন্ত তার মাথার ভেতর একটা দুর্দান্ত ঠাট্টা কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। এ রকম জটিল ঠাট্টায় বহুকাল পড়েনি। কোনদিকে মোড় নেবে কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছে না। এতক্ষণ ধরে ব্যাপারটা থেকে মুক্তি না পাওয়ায় তার একরকম দুর্ভোগই হচ্ছে। ন্যাংটো আবদুল করিমকে দেখামাত্র ঠাট্টার মারপ্যাঁচ থেকে কিছুটা হলেও সে বেরিয়ে আসে।

শোবারঘরে ফিরে দেখে সোমা মেঝেতে পা ছড়িয়ে দৈনিক কাগজের অংকধাঁধা ভাঙছে। মেয়েকে ডেকে মাহমুদ ধাঁধা দেয়, একজন অসাধু গোয়ালা প্রতি লিটার দুধে আড়াইশো মিলিলিটার পানি মেশায়...। মেয়ে বিরক্ত হয়ে বলে, অসাধু কী?

যে দুধে পানি মেশায়।

তাহলে সাধু?

যারা দুধ খায়।

পড়ন্ত দুপুরে জয়েন্ট রেজিস্ট্রার অবঃ-র শান্তির নীড়ের কোণ ঘেঁষে একটা ছোট জমায়েত একটু একটু করে বড় হয়, সরব হয়। দুধে পানি, তাতে কী! বিষ তো না! পানি দেবে না, মধু দেবে! শালাদের খাঁটি দুদু খাওয়ার শখ। খা না শালারা, একটা খা, একটা হাতা, মানা করে কে? খুচরা, অসংলগ্ন প্রতিক্রিয়াগুলো এর মুখ ওর কান হয়ে ঘুরে ঘুরে একটা অনিশ্চিত লক্ষ্যবিন্দু খোঁজে। ব্যাপারটা নির্ঘাৎ বিরোধী পার্টির চাল। ডলফিন গলির আবালবৃদ্ধবনিতার দুধের প্রতি লোভটাকে পুঁজি করে চালটা চেলেছে। এদিকে সরকার পার্টি না বুঝেই ইডিয়টের মতো তাল ঠুকছে। বুদ্ধু কাহাকা! আরে, দুধ-পানি আলাদা করার উপায় আছে!

বিকেলের ছায়ামোড়া ডলফিন গলিতে পরিস্থিতি বেশ পাল্টায়। আবদুল করিমকে নিয়ে অহেতুক দীর্ঘসূত্রিতায় লোকজন ত্যক্তবিরক্ত হয়ে পড়ে। একঘেয়ে দৃশ্য থেকে মুক্তির আশায় কারা যেন তার কোমরের নারকেল ছোবড়ার দড়ির

গিটটা ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলগা করে দেয়, পিছমোড়া হাত দুটোও খুলে দেয়। আর তখনি সে হুমড়ি খেয়ে দাদ-এগজিমা আকীর্ণ দুই ভাঁজ উন্মুক্ত পাছা উপুড় করে লুটিয়ে পড়ে। যারা কাজটা করে, তারা আফসোস করে। এর চেয়ে দড়িবাঁধা অবস্থায় নিম্নাঙ্গের উদোম সামনের অংশটাই বরং ভালো ছিল।

এ পর্যায়ে একটা আশঙ্কা লোকজনের মনে একটু একটু করে ঠাঁই পেতে থাকে। এদিকে দিনের আলো সারাক্ষণ বহাল থাকে না, আর থাকে না বলেই আসন্ন অন্ধকারে নানা গুজব উড়ে বেড়ায়। সে সব অধিকাংশই আবদুল করিমের মৃত্যু সংক্রান্ত। একটা সাধারণ, গোবেচারা মানুষের আসন্ন মৃত্যু গলি-নিবাসী মানুষজনের কাতরতা মমতা সহানুভূতির তুলতুলে জায়গাগুলো দখল করে বসে। তারা নানা কথা বলে। দুধ ও পানির ব্যাপারটা তাদের কাছে স্ক্রু-আঁটা ধাঁধার মতো ঠেকে।

কিন্তু ঘটনা হলো, আবদুল করিম জীবিত, জ্যান্ত। তবে তাকে এভাবে ফেলে রাখা কিছুতেই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হয় না। কারণ পরিস্থিতি এখন এমন, মৃত্যু তাকে যেকোনো মুহূর্তে আলিঙ্গন করতে পারে। এ অবস্থায় চিন্তাভাবনার পর বিরোধী নেতার বাড়ির সামনা থেকে তাকে সরিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত নিভৃত উপগলির খোলা ম্যানহোলে চেষ্টা চালানো হয়। গর্তটা ছোট। আবদুল করিমের দাদ-এগজিমা আকীর্ণ উলঙ্গ শরীর সে তুলনায় অনেক বড়।

এক উপগলির পর অন্য উপগলি, ম্যানহোলের পর ম্যানহোল। কিছুতেই সম্ভব হয় না। ম্যানহোলের পরিবর্তে সে ঘাড়ে ঘাড়ে ঘোরে। যারা তাকে বয়ে বেড়ায়, তারা অনুভব করে, একটু একটু করে চাপ বাড়ছে। উপায় কী! ঘাড়ে ঘাড়েই তাকে রাখতে হচ্ছে, একটা যোগ্য গর্ত যতক্ষণ না ...

লোকমান হাকিমের স্বপ্নদর্শন

রিকশা ভাড়া মেটাতে গিয়ে লোকমান হাকিমের মনে হলো দিনটা ভালো যাবে। রিকশাওয়ালা ক্যাঁচম্যাচ করল না। দশ টাকার নোটটা বাড়িয়ে যেই জাঁদরেল গলায় বলল– পাঁচ টাকা দাও, রিকশাওয়ালা সুড়সুড় করে এক টাকার তিনটা আর দুই টাকার একটা ময়লা নোট ফেরত দিয়ে দিল। টাকা ক'টা হাতে নিয়ে লোকমান হাকিম ঘাড় ঘুরিয়ে স্ত্রীকে দেখল। স্ত্রীর নজর অন্য দিকে, গেটের ভেতরে, অনেকটা ভেতরে, প্রায় সিঁড়ির কাছাকাছি। সেখানে দারোয়ান গোছের দুটো লোক কী নিয়ে কানাকানি করছে আর মুখ লাল করে পান খাচ্ছে।

স্ত্রীকে নিয়ে লোকমান হাকিম গুটিগুটি পায়ে সিঁড়ি পর্যন্ত চলে এল। লোক দু'জন এতক্ষণে তাদের খেয়াল করল। দু'জনের মধ্যে টিঙটিঙে আর বেগুনি শার্ট পরা লোকটা মুখভর্তি পিক সামলাতে সামলাতে ঠোঁটজোড়া চিকন আর গোল করে জানতে চাইল– কার কাছে যাইবেন?

লোকমান হাকিম বিরক্ত হলো। গত দুই বছর ধরে এখানে আসছে, কার কাছে যাবে, সে জানে না! সে জবাব দিল না, ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। তবে সামনে পা বাড়াতেই লোকটা ফোড়ন কাটল– ডাক্তার কিন্তুক পাঁচজন। লোকমান হাকিমের বিরক্তির পরিমাণটা আরো বাড়ল। স্ত্রীর দিকে ফিরে, 'চলো' বলে সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে, স্ত্রী বলল– অ্যাই, দেখো...

লোকমান হাকিম দেখল। স্ত্রীর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সিঁড়ির গোড়ায় দুই সারি কচু গাছের ওপর। সব মিলিয়ে দশ-বারোটা গাছ। পাতাগুলো অন্যরকম, চক্রাবক্রা। গাঢ় সবুজের ওপর টকটকে লাল ফোঁটা, ছোট-বড়ো নানা মাপের ফোঁটা। এমন রংচঙের কচুগাছ লোকমান হাকিম জীবনে দেখেনি, তার স্ত্রী দেখবে কোত্থেকে। কিন্তু কচু গাছের মতো বেহায়া, নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের পক্ষে এমন সাজগোজর ব্যাপারটা সে সহজভাবে নিতে পারল না। মনে মনে সে নিশ্চিত হয়ে গেল এটা এই শালাদের কাজ, পানের পিক ফেলে গাছগুলোর এ অবস্থা করেছে। স্ত্রী তাকিয়ে আছে গাছগুলোর দিকে, মুখটা আহ্লাদে ডগোমগো, পারলে এখুনি কোলে তুলে 'সোনা, আমার সোনা' বলে গালে কপালে চুমু খায় আর কি! একটু আগের বিরক্তিটা এবার পুরোদস্তুর রাগে রূপ নিল। লোকমান হাকিম চাপা গলায় একটা জাঁদরেল ধমক ছুড়ল– বিলকিস, চলো। রেগে গেলে তার গলায় এক ধরনের ঘর্ঘর আওয়াজ ওঠে। স্ত্রী বিলকিস বানু তা জানে। দু'জন এরপর একটার পর একটা সিঁড়ি টপকাতে থাকে। পেছন থেকে বেগুনি শার্ট বলে ওঠে– ও, নিজামুদ্দিন স্যারের কাছে যাইবেন? সোজা তিনতলা।

দেড়তলা পর্যন্ত এসে লোকমান হাকিমের হাঁপ ধরে গেল! জোরে পা চালিয়েছে বলেই হয়তো। চারপাশে ওষুধ-ওষুধ গন্ধ। হাঁপ ধরলে লম্বা শ্বাস নিতে হয়; কিন্তু এখানে তা করলে ওষুধের গন্ধে ফুসফুস ঝাঁজরা হয়ে যাবে। বিলকিসের হাবভাবে ক্লান্তি নেই, দুলকি চালে চলছে। স্বামীকে থেমে পড়তে দেখে ঝট্ করে রেলিং ধরে ঝুঁকে বলল– কী?

–কী আবার!

–দুইটা সিঁড়ি না ভাঙতে এই অবস্থা!

–ঘরের বাইরে এসে পাগলামিটা একটু কম করলে তো পারো। জীবনে কচুপাতা দেখোনি?

–দেখব না কেন? তবে এ জাতের পাতা এই প্রথম দেখলাম। তুমি দেখেছ নাকি যে আমাকে বলছ!

জবাবে লোকমান হাকিম জোরে দু'বার নিশ্বাস ফেলল, তারপর বিড়বিড় করে বলল– দারোয়ানটা পর্যন্ত বুঝল পাগলের ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।

দুপুরবেলা অফিসে বসেই লোকমান হাকিম টের পাচ্ছিল ভেতরে উত্তেজনা হচ্ছে। কাজকর্মে মন বসাতে পারেনি, অস্থির-অস্থির লাগছিল। কখন ঘরে ফিরবে– গোসল, খাওয়াদাওয়া সেরে রেডি হয়ে বিলকিসকে নিয়ে বেরুবে, চিন্তাটা সরাক্ষণ মাথায় ঘুরঘুর করছিল। দুটো চল্লিশে ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার সময়ও মনে হয়েছে তাড়াতাড়ি করা দরকার। অথচ ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপেয়েন্টমেন্ট সেই বিকেলে। অস্থিরতার কারণ যে নেই তা-না, বিলকিস পরশু রাতেও স্বপ্নটা আবার দেখেছে। এই নিয়ে কম করে হলেও সাত-আট বার দেখল।

তিনতলায় উঠে লোকমান হাকিম নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ল। গত দুই বছরে চারবার এখানে এসেছে। কোনো বারই সিঁড়ি

ভাঙতে এত পরিশ্রম করতে হয়নি। এবারই প্রথম সে লক্ষ করল সিঁড়িগুলো সাধারণ সিঁড়ি না, ধাপগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক উঁচু। সেগুনবাগিচায় এজিবি বিল্ডিং-এ তার অফিসটাও তিন তলায়, সেখানে রোজই কয়েকবার, অন্তত চার থেকে ছয় বার, তাকে সিঁড়ি ভাঙার কাজ করতে হয়। তবে এমন অবস্থা কখনোই হয়নি।

তিনতলায় ওঠার মুখে কালো রং করা কাঠের ওপর সাদা অক্ষরে ডাক্তার নিজামুদ্দিন এম আর সি পি– লন্ডন এর নেমপ্লেট। পরপর দুটো ঘর। পাশাপাশি হলেও একটার ভেতর দিয়ে অন্যটায় যেতে হয়। প্রথম ঘরটাতে এরই মধ্যে পনের-ষোলজন মানুষ চেয়ার দখল করে বসে আছে। একটামাত্র চেয়ার দেখা গেল ফাঁকা, বেতের চেয়ার, ছানি আলগা হয়ে এক দিকে বেঁকে আছে। দেখেশুনেই এটায় কেউ বসেনি। বিলকিস হাত ধরে লোকমান হাকিমকে চেয়ারটায় বসতে ইঙ্গিত করতে সে না বসে পারল না। এত ক্লান্ত লাগছে, জোরে শ্বাস না টেনে উপায় নেই– বাতাসের বদলে ওষুধ ঢুকবে, ঢুকুক।

মিনিট পাঁচেক একটা ঘোরের মধ্যে পর করে লোকমান হাকিম চোখ খুলল। খুলেই নিজের কাণ্ড দেখে বোকা বনে গেল। এসেছে রোগী নিয়ে, গত দিন অফিস পালিয়ে এখানে নাম লিখিয়ে গেছে– সাত নম্বর সিরিয়েল; অথচ এখন তার হাবভাবে কে বলবে, সে নিজেই রোগী না! এদিকে ওদিকে তাকিয়ে সে বিলকিসকে পেল না। ডানে-বাঁয়ে, মুখোমুখি সব অপরিচিত মুখ– মহিলা, পুরুষ। এক কোণে বছর দশেকের একটা ছেলেও রয়েছে। বিলকিস এদের মধ্যে নেই, ফাঁকতালে সটকে পড়েছে। উঠবে উঠবে করে সে উঠল না। চেয়ারটা ভাঙা হলেও বসার কাজ চলছে, উঠলে বেদখল হয়ে যাবে। প্রথমে তো ভাঙা দেখে কারো আগ্রহ হয়নি বসার, তবে তাকে একবার বসতে দেখার পর কারো না কারো প্রেরণা জাগবেই।

লোকমান হাকিম বসে বসে কিছুক্ষণ লোকজন দেখল, দশ বছরের ছেলেটাকে দেখল বিশেষ করে। ওপাশের ঘর আর এই ঘরের মাঝখানে দুই পাট দরজা একটুখানি ফাঁকা, সাদার উপরে সবুজ স্ট্রাইপ পর্দা দরজার ফাঁকে সাপের মতো দোল খাচ্ছে। পর্দা আর মেঝের মাঝখানে বিঘত পরিমাণ জায়গায় ভেতর থেকে আসা টিউবলাইটের নরম, ঠাণ্ডা আলো। লোকমান হাকিম খেয়াল করল তার চোখ দুটা ঘুরেফিরে মানুষজনের মুখ, দশ বছরের ছেলেটার মুখ, পাটভাঙা দরজায় দাঁড়ানো বেয়ারার মুখ, দেয়ালে বসানো 'আপনার শিশুকে টিকা দিন'-এর মুখ, নো স্মোকিং-এর ক্রসচিহ্নের ভেতর তেড়েফুঁড়ে ওঠা সিগারেটের মুখ হয়ে বারবার পর্দার তলায় গোটানো ঠাণ্ডা আলোর ওপর গিয়ে পড়ছে। এমন সময় ভেতরের ঘর থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে আসতে দরজাটা হাঁ হয়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে পর্দার নিচে লেজ গোটানো আলোটাও লাফিয়ে উঠল। দরজার পাট দুটো আবার ঘনিষ্ঠ হতে আলোর রেখাটা অদৃশ্য হয়ে গেল। যে দু'জন বেরিয়ে এল, তাদের মধ্যে কে যে রোগী, অর্থাৎ পাগল, বোঝা মুশকিল। দু'জনই বেশ স্বাস্থ্যবান, হাসিখুশি, একজনের হাতে ধরা কিছু কাগজ। ভেতরের ঘর থেকে এমন সময় টুং করে মিষ্টি আওয়াজ হলো, অনেকটা ওই নরম, ঠাণ্ডা আলোটার মতো। দরজায় দাঁড়ানো বেয়ারা এবার একটা নাম ডাকল। লোকমান হাকিম হঠাৎ অস্থিরতা অনুভব করল। সাত নম্বর কি ডাকা হয়ে গেছে? গতকাল অফিস থেকে ভেগে নাম লেখানোর পর আর অফিসে ফিরে যায়নি। মনে হয়েছিল, অফিস করার চেয়ে বাসায় গিয়ে বিলকিসকে খবরটা দেয়া জরুরি। খবর শুনে বিলকিস কী রকম অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে বলেছিল– আবার পাগলের ডাক্তার। কিন্তু এখন বিলকিস গেল কোথায়? লোকমান হাকিম বুঝতে পারল, ভেতরে তার একটু একটু করে রাগ জমতে শুরু করেছে। পর্দার তলায় এতক্ষণ সুন্দর আলোটা ছিল, আলোটা আর নেই ভাবতে রাগটাও যেন ডালপালা ছড়াতে লাগল।

লোকমান হাকিম উঠল, আর ওঠামাত্র বুঝতে পারল, ভেতরের রাগ-ঝাল ছাপিয়ে তার দুই হাঁটুতে ভর করে আছে লজ্জা। লাজুক পায়ে দরজা আগলে দাঁড়ানো বেয়ারার কাছে গিয়ে গলা নামিয়ে বলল– ভাই, কত চলছে?

বেয়ারা মুখ উদাস করে বলল– সময় হলে ডাকব।

একটা চড় লাগাতে ইচ্ছা করলেও লোকমান হাকিম সামলে নিল। বলল– তা তো জানি, তা তো জানি, তবু সিরিয়েলটা ...

–চার।

ভীষণ নিরাপদ বোধ করে লোকমান হাকিম ঘুরে দেখল চেয়ারটা বেদখল হয়ে গেছে। বোরখা-পরা এক মহিলা চেয়ারটাকে কালো গিলাফে ঢেকে দিয়েছে। সে কিছু মনে করল না। নিজের মনোভাবে সে নিজেই অবাক হলো। মহিলা মানুষ, গরমের মধ্যে পা থেকে মুণ্ডু পর্যন্ত ঢেকে আছে, কতক্ষণ আর দাঁড়াবে! বসুক, ফ্যানের বাতাস-টাতাস ওখানে লাগবে না, তবু পা জোড়া তো হালকা হবে, বসুক।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পা দিতেই লোকমান হাকিম দেখল বিলকিস পেছন ঘুরে দাঁড়িয়ে। কোমর প্যাঁচানো নীল

বুটিদার শাড়ি বাতাসে অল্প-অল্প দুলছে। গেলবার বকরি ঈদে সে নিজে পছন্দ করে গাউসিয়া থেকে শাড়িটা কিনে দিয়েছিল। শাড়ির কথা ভাবতে গিয়ে পরমুহূর্তেই তার খটকা লাগল, বকরি ঈদে শাড়ি দিতে যাবে কোন দুঃখে! এক ভাগা কোরবানিতে বাড়িওয়ালার সঙ্গে শামিল হতেই বোনাসের টাকাকড়ি হাওয়া। তাহলে? ... ও মনে পড়েছে, বকরি ঈদের সঙ্গে শাড়িটা জড়িয়ে ফেলা আহাম্মুকি ছাড়া কিছু না। শাড়িটা গাউসিয়া না, মৌচাক থেকে কিনে দিয়েছিল তার বড় বোন, রুবি। সেবার খুলনা থেকে ঢাকায় সপরিবারে বেড়াতে এসে তিন দিন ছিল তাদের তল্লাবাগের বাসায়। দুলাভাই আর বোনকে শুতে দেওয়া হয়েছিল খাটে, বাকিরা– লোকমান হাকিম, বিলকিস আর বোনের দুই বাচ্চা মেঝেতে চাদর বিছিয়ে। ভালো ঘুম হয়েছিল রাতে, মশা–টশা একদম ছিল না। ঠিক এ রকম একটা নীল বুটিদার কবে যে গাউসিয়া থেকে কিনে দিয়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও লোকমান হাকিম মনে করতে পারল না।

ঘরের তুলনায় বারান্দাটা ভালো। কেন যে মানুষগুলো ভেতরে গিজগিজ করছে, লোকমান হাকিম ভেবে পেল না। চওড়া বারান্দা, বাইরে থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। বিলকিস ঝুঁকে আছে বারান্দার রেলিঙে কনুই চেপে, নিচের দিকে তাক করা চোখ, যেন একটা ঝুলন্ত দড়ি বেয়ে দৃষ্টিটা নেমে গেছে সোজা নিচে। লোকমান হাকিমের সন্দেহ হলো, নির্ঘাৎ কচুপাতার ওপরই ওর চোখ, কিন্তু এখান থেকে পাতাগুলো কি দেখা যাচ্ছে? পায়ে পায়ে সে রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, আর তখনি বিলকিস লোকমান হাকিমকে তার দৃষ্টি অনুসরণ করার সুযোগ না দিয়ে, যেন জানে লোকমান হাকিম চোরের মতো তারই পাশে দাঁড়ানো, ঘুরে বলল– সাত নম্বর আসতে এত দেরি!

–কোথায় দেরি? এই না আসলাম। এখন চার চলছে– পাঁচ, ছয়, তারপর আমরা।

–আমরা মানে?

–আমি সঙ্গে যাব না! বরাবরই তো যাই, যাই না? ডাক্তার কী না কী জানতে চান! তাছাড়া...

লোকমান হাকিম একটু দ্বিধা করল, বিলকিসের চোখের দিকে তাকাল, তারপর বলেই ফেলল– তাছাড়া পরশু রাতের ঘটনাটা ডাক্তার সায়েবকে বলা দরকার।

–না।

এত জোরের ওপর বিলকিস কথাটা উচ্চারণ করল, লোকমান হাকিম চমকে গেল। তার কথার ওপর জোর খাটানোর অভ্যাস বিলকিসের একদম নেই। তার রাগ হলো। তবে বারান্দায়, রেলিঙের কাছাকাছি থাকায়, ঠাণ্ডা বাতাসটা গায়ে লাগায়, রাগটা সে হজম করে ফেলল।

বিলকিস আবার বলল– না, ওসব বলার দরকার নেই।

এবার লোকমান হাকিম ভড়কে গেল। এমন তো করে না। সে রীতিমতো অনুনয় করে বলল– না কেন? একশো টাকা ভিজিট দেব, তুমি নেহায়েত পুরনো পেশেন্ট বলে একশো টাকা কনসেশান, না হলে তো দুশো টাকাই খসতো। একশো টাকা কি কম? এই বাজারেও হাতিরপুলে বেস্ট কোয়ালিটি দেড় কেজি খাসির মাংস পাওয়া যায়।

এতদূর এসে লোকমান হাকিম থামল। গোছগাছ করে কথা বলতে সে একদম পারে না। বিলকিস পারে। বিলকিসকে মাঝে মাঝে কথায় পেয়ে বসে, এমন মুহূর্তে তার চোখের পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে মুখের ওপর কী রকম ছায়া ফেলে, লোকমান হাকিমের তখন বুক চিনচিন করে। বিলকিসকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বলল– মনের কথা বলতেই তো ডাক্তারের কাছে আসা। গতকাল কী অবস্থায় নাম লেখালাম জানোই তো– ফরচুনেটলি এও স্যার মেয়ের অসুখ বলে অফিসে আসেননি, না হলে তো বেরুতেই পারতাম না। পরশু রাতের স্বপ্নের দৃশ্যগুলো মনে মনে ঠিক করে রাখো, ঠিক এগজেক্ট ফ্যাক্টটা বলা দরকার, ফার্স্ট টু লাস্ট যা-যা দেখলে, যেভাবে দেখলে, সব বলবে। জানোই তো, নিজামুদ্দিন ডাক্তারের নাগাল পাওয়া সোজা কথা না, মানুষের মুখে মুখে নাম, পাগলা নিজাম...

শেষ কথাগুলো লোকমান হাকিমের পছন্দ হলো না, মনে হলো আসল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত বিলকিসের দিকে তাকিয়ে আবার শুরু করল– ডাক্তারের কাছে সব কথা বলতে হয়; হাসিকান্না, দুঃখবেদনা যা মনে আসে, সব। যত বলবে তত সুবিধা, ডাক্তার চট করে তোমার কেস ধরে ফেলবে। মনের ভাব ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারায় লোকমান হাকিম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল– আরে, এই নিজামুদ্দিন যে-সে না, সাইকিয়াট্রিস্ট অ্যান্ড সাইকোলজিস্ট।

–মানে?

–মানে...

লোকমান হাকিম এতক্ষণে মুখটা হাসি-হাসি করল, বুঝতে পারল বিলকিস পথে আসছে। বলল– মানে, মানে হলো গিয়ে, মনের রোগের ডাক্তার যেমন, মানুষের মনের খবরাখবর রাখার বেলাতেও মহা ওস্তাদ।

—মানে?

লোকমান হাকিম এক ঝলক স্থির চোখে বিলকিসের চোখে তাকাল, তারপর কী ভেবে ঝট্ করে ঘুরে ঘরের ভেতরে চলে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যে ফিরে এসে বলল– চার নম্বর কেস খারাপ, এখনো চলছে। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে সময় হিসাব করে বলল– বারো মিনিট ধরে চলছে। চার নম্বর এতক্ষণ ধরে চলায় সে অখুশি হলো না। বরং মনে মনে একটা অঙ্ক দাঁড় করিয়ে ফেলল। চার বেরুনোর পর পাঁচ ঢুকবে, পাঁচ বেরুবে, তারপর ছয়, ছয়ের পর সাত; এখন যদি চার আরো দুই মিনিট ভেতরে থাকে, পাঁচ ঢুকে স্লামালেকুম দিয়ে বসতে বসতে এক মিনিট, বসার পর ধরা যাক বারো মিনিট– মোট বারো আর এক তের আর দুই, পনেরো মিনিট; ছয় ঢুকতে এক মিনিট, কেস যদি পাঁচের মতো হয়, তাহলে ধরা যাক বারোই– মোট বারো আর এক তের আর হাতের পনেরো, আটাশ মিনিট। দুই মিনিট এদিক ওদিক হলে, এখন ঘড়িতে পাঁচটা দশ, পাঁচটা চল্লিশের মধ্যে বিলকিসের ডাক পড়বে। আধ ঘণ্টা বারান্দার এই সুন্দর বাতাসে দাঁড়ানো কিছু না। ভেতরে গাদাগাদি করে বসা লোকগুলোর বোকামিতে লোকমান হাকিম মজা পেল। এখানে তার বেশ ভালো লাগছে। একটা সিগারেট ধরাতে পারলে ভালো লাগাটা আরো বাড়ত। বুকপকেটে কাগজপত্রের ভাঁজে দুই শলা ব্রিস্টল আছে, প্যান্টের বাম পকেটে আঙুল ছুঁইয়ে ঘরের চাবির পাশে ম্যাচটাও টের পেল। কিন্তু ইচ্ছাটা দমন না করে উপায় নেই। মনটাকে ঘোরাতে বারান্দায় দেয়ালে চোখ ফেলতেই সে দেখার মতো জিনিসটা পেয়ে গেল। ডাক্তার নিজামুদ্দিনের নেমপ্লেট। নামধামসহ ভূতপূর্ব আর বর্তমান বৃত্তান্ত মিলে হাতখানেকের কালো তক্তার ওপর সাদা অক্ষরে এমাথায় ওমাথায় পৌনে পাঁচ লাইন। বড় বড় ডাক্তারদের নামধাম খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়া লোকমান হাকিমের বহু দিনের অভ্যাস, হবিও বলা যায়। একেকটা নাম, নামের শেষে বিচিত্র অনুভূতি জাগানো অক্ষরের পর অক্ষর। অক্ষরগুলো মিলেমিশে এক দুর্জ্ঞেয়, মোহময় আবহ– ঢাকা, লন্ডন, এডিনবরা, মস্কো, ভিয়েনা। পথেঘাটে চলতে-ফিরতে লোকমান হাকিম এ ধরনের আবহ উদ্রেককারী সাইনবোর্ডগুলো পড়ে; শুধু পড়েই না, মনে রাখারও চেষ্টা করে। সেগুনবাগিচায় তার অফিসের কোলিগরা ডাক্তারদের কার কোথায় চেম্বার, তার কাছে খোঁজ করে। সে যে সাইনবোর্ড পড়ে, আবার মনেও রাখে, এসব কোলিগদের জানার কথা নয়। ব্যাপারটা তার পরও কীভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে গলির মোড়ে মোড়ে ঘুপচি ফার্মেসির ততোধিক ঘুপচি ঘর আলো করা ডাক্তারদের বেলায় তার অনুভূতি চূড়ান্ত নিরাসক্ত, এদের প্রতি লোকমান হাকিমের আগ্রহ নেই। লম্বা সাইনবোর্ডধারী সব বড় ডাক্তাররা যে একগোত্রীয়, তা কিন্তু না; বড়রও বড় থাকে, বটগাছের ওপর অশ্বত্থ গাছ, শোল মাছের ওপর গজার মাছ, বাঘর ওপর ঘোগ। ডাক্তারদের বেলা এই ঘোগ হচ্ছে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ। মানসিক রোগের ডাক্তারদের প্রতি লোকমান হাকিমের ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণ খুঁজতে কিছুটা পেছনে যেতে হবে।

বছর তিনেক আগে লোকমান হাকিম আবিষ্কার করতে শুরু করে তার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী বিলকিস বেশ অন্যরকম। বিলকিস সাধারণের মতো নয়, লোকমান হাকিমের মতো নয়। বিলকিস বড় বেশি পরিপাটি, এতটা পরিপাটি–বিয়ের চারদিনের মাথায় লোকমান হাকিমের শার্টে বোতাম লাগাতে গিয়ে সে এত গভীর মনযোগে একটার পর একটা সুঁইয়ের ফোঁড় তুলল, যত্ন করে গেরো দিল, দাঁত দিয়ে সুতা কাটল–লোকমান হাকিম অভিভূত হবে কী, তার মন বলল কিছু একটা আছে।

বিলকিস কথা বলে গোছগাছ করে, গল্পের মতো করে। রোজ বিকালে সিঁথি কেটে খোঁপা বাঁধে, আবার ফুল-টুলও দেয়। কোনো দিন কপালের মাঝ বরাবর জ্বলজ্বলে টিপ পরে চেহারাটা এমন বদলে ফেলে, লোকমান হাকিমের চিনতে কষ্ট হয়। দেখে দেখে তার খটকা লাগে, তবে কারণটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে সময় লাগে। দিনে দিনে বিলকিসের নানা বাতিক ধরা পড়ে। যেমন– এক রাতে দুম করে জিজ্ঞেস করে বসল, লোকমান হাকিম কাউকে প্রেম পত্র লিখেছে কী না; আরেক রাতে ঘুম ভেঙে লোকমান হাকিম দেখল বিলকিস অপলক চোখে তাকে দেখছে। চোখাচোখি হতেই বলল– তুমি বড় সুন্দর! এসব কথাবার্তায় লোকমান হাকিমের গায়ে কাঁপুনি আসে, নিজের কানকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। মানুষটা সে এতই সাধারণ, সেগুনবাগিচায় অফিসের তিনতলায় ময়লা একটা টেবিল, হাতাভাঙা চেয়ার আর একগাদা লেজার-রেজিস্টারের বাইরে চোখ ফেলার কথা ভাবতে পারে না। সুন্দরী কোনো মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রেমপত্র লেখার দুঃসাহস সে কল্পনাও করতে পারে না। আবার দেখতে শুনতেও সে একরকম কুৎসিতই। গায়ের রং বেশ ময়লা, গর্তে বসা চোখ, কপাল জুড়ে ছোটবেলার বসন্তের দাগ, মাথায় চুল পাতলা হয়ে পেছন দিকে খুলির জোড়ের অংশটুকুই যা ঢাকা পড়ে। অন্যদিকে লম্বায়ও সে খাটো, রীতিমতো বেঁটেখাটো, টেনেটুনে পাঁচ ফুট দুই হবে কি-না, তবে এ তুলনায় ঘাড়, কাঁধ, বুক বাড়াবাড়ি রকম চওড়া। এ অবস্থায় বিলকিসের মুখে সাংঘাতিক কথাগুলো শুনে লোকমান হাকিম স্ত্রী সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা খাড়া করে ফেলে।

বিয়ের অল্প দিনের মধ্যে বিলকিসের বিষয়ে লোকমান হাকিম অন্য যে আবিষ্কারটা করে, তাতে সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। বিলকিস অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। রাতে কিংবা দিনে, চোখের পাতা এক করামাত্র ঝাঁকে-ঝাঁকে স্বপ্ন তার মগজের অলিগলি

চষে বেড়ায়। যেমন– বিয়ের সপ্তা দুয়েকের মাথায় বিলকিস স্বপ্ন দেখল লোকমান হাকিম পাল্কি চড়ে বিয়ে করতে যাচ্ছে। বউটা দেখতে বিশ্রী, কালো, তার ওপর মোটা, তার ওপর বাম চোখটা ট্যারা। দু'দিন না যেতেই বিলকিস দেখল, মহাধুমধামে তার নিজের বিয়ে হচ্ছে সেই ফরসা, লম্বা ছেলেটার সঙ্গে যে তাকে নাখালপাড়ায় বোনের বাসায় দেখতে এসে অর্ধেকটা কালোজাম মুখে পুরে হুট করে পালিয়ে গিয়েছিল। তখন সবে বিয়ে হয়েছে বলে, বিয়েজনিত বিষয়গুলিই স্বপ্নে প্রাধান্য পেত। কিছু দিন পর বিষয় বদল হতে দেখা গেল জগতে এমন জিনিস নেই, যা নিয়ে বিলকিস স্বপ্ন দেখে না, বা দেখতে পারে না। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারগুলো পর্যন্ত সে স্বপ্নে মিটমাট করে ফেলে। যেমন– বিকালবেলা কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু বৃষ্টি বা রিকশা ভাড়া যে কারণেই হোক, যাওয়া হলো না, রাতে ঘুমের মধ্যে সে জায়গাটা ঘুরে এল। ঘরে বাজার নেই, এদিকে ইলিশ মাছ খেতে ইচ্ছা করছে, চিন্তা কী, রাতভর সর্ষেবাটা ইলিশের স্বাদ মুখে নিয়ে টানা ঘুম দিল।

লোকমান হাকিম কদাচিৎ স্বপ্ন-টপ্ন দেখে। সেগুলোকে স্বপ্ন না বলাই ভালো। যেমন– এও স্যার মোটা একটা লেজার খুলে রাগি গলায় তাকে ধমকাচ্ছেন; নয়ত মাছবাজারে গেছে শুক্রবার সকালবেলা, এক ভাগা চাঁপিলা মাছ দরদাম করে টাকা দিতে যাবে, দেখল মানিব্যাগ ফেলে এসেছে। ঘুম ভাঙার পর এসব ঘটনার কথা তার মনেও থাকে না। বিলকিসের মতো পর্বের পর পর্বে ভাগাভাগি স্বপ্ন দূরে থাক, জোড়াতালির কোনো স্বপ্নও তার মাথায় খেলে না। বরং চোখ-কান বন্ধ করে মাথার ভেতরটা শূন্য, ফাঁকা, অন্ধকার করে ঘুমানোর পরও বিলকিস কী করে স্বপ্নের পথেঘাটে একা একা ঘোরে, ভাবতে গেলে তার নিজের মাথাটাই ফাঁকা, ধু ধু হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় ডাক্তার নিজামুদ্দিন এমআরসিপি-লন্ডন এর শরণাপন্ন না হয়ে লোকমান হাকিমের উপায় ছিল না।

নিজের স্বপ্ন দেখা নিয়ে বিলকিসের জড়তাটড়তা নেই; ব্যাপারটা যে লোকমান হাকিমের জন্য ভোগান্তির, টাকা খরচ, এসব নিয়ে সে আশ্চর্য বিকারহীন। বরং লোকমান হাকিম তাকে পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে, এই বোধটুকু অমর্যাদাকর মনে হলেও তার ভাবখানা এমন, এক ছুতায় তল্লাবাগের দেড় কামরার ঘর থেকে তো বেরুনো যাচ্ছে, চওড়া মিরপুর রোডে রিকশার হুড তুলে বা নামিয়ে খোলামেলা ঠাণ্ডা বাতাস খাওয়া যাচ্ছে, লোকজন গাড়িটাড়ি ভিড়ভাট্টা দোকানপাট দেখা যাচ্ছে!

চার-চারবার ডাক্তার দেখানোর পরও বিলকিসের স্বপ্ন দেখায় ভাটা পড়েনি। সমস্যাটাকে ডাক্তার খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে লোকমান হাকিমের মনে হয় না। কিন্তু এত বড় ডাক্তার, লোকমান হাকিম আস্থা হারায় কী করে! এমন হতে পারে, আগে যে ক'বার এসেছে, বিলকিসের স্বপ্নবিষয়ক জটিলতা ডাক্তারকে ঠিক মতো বোঝাতে পারেনি। তবে পরশু রাতের স্বপ্নটা ডাক্তারের জন্য একটা বড় ক্লু হতে পারে। স্বপ্ন নিয়ে লোকমান হাকিম মাথা না ঘামালেও এ স্বপ্নটাকে সে নিজে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। পরশু রাতের স্বপ্নটা যে শুধু পরশু রাতেই দেখা তা-না, পরশুর আগের পরশু, তারও আগে, সম্ভবত দিন-পনেরো ধরে ভেঙে ভেঙে নানা পর্বে-অধ্যায়ে স্বপ্নটা বিলকিস দেখে আসছে।

বিলকিসের অসংখ্য উদ্ভট স্বপ্নের মতো এ স্বপ্নটাও উদ্ভট, আবার বাস্তবও। উদ্ভট, যেমন– বিলকিস দেখল, তার একটা পরীর মতো ডানাওয়ালা ছেলে হয়েছে। মাথা চোখ মুখ পা সবই মানুষের মতো; তবে হাত নেই, হাতের বদলে পরীদের মতো ডানা। জন্মনোর পরপরই ছেলেটা ডানা ঝাপটে ঘরের চার দেয়ালে পাক খেতে লাগল, আর দেয়াল ঘেঁষে ওড়ার সময় ঘরের ভেতরটা নরম, মিষ্টি আলোয় ভরে উঠল। এত দূর পর্যন্ত স্বপ্নটা উদ্ভট, গাঁজাখুরি; কিন্তু এর বাস্তব দিক হচ্ছে, বিলকিসের পেটে সত্যি সত্যি বাচ্চা। সবে তিন মাস বলে, বিলকিসকে দেখে কেউ চট করে অনুমান করতে পারবে না। প্রথম যেদিন বিলকিস স্বপ্নটার কথা বলল, লোকমান হাকিম হতবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন অভাবনীয় স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত, ভেবে উঠতে পারেনি। অল্প সময়েই তার মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। এমন বিষয় নিয়ে কেন বিলকিস স্বপ্ন দেখতে গেল? নিজের পেটের বাচ্চা নিয়ে কেউ ইয়ার্কি করবে ভাবা যায়? বিয়ের পর বাচ্চা হবে, এ তো স্বাভাবিক ঘটনা, সবার বেলা হয়, কারো-কারো বেলা অবশ্য ব্যতিক্রম, তবে হওয়াটা স্বাভাবিক, উচিতও। এখানে স্বপ্নের বুজরুকি কী জন্য? বাচ্চা যখন হবে, ছেলে বাচ্চা হওয়াই ভালো। লোকমান হাকিমও একটা ছেলে বাচ্চা চায়, ছেলে কার মতো হবে, সে কী করে বলবে! তাই বলে হাত কেটে পাখা লাগাতে হবে? পায়ে না হেঁটে বাচ্চাটা পাখা ঝাপটে চার দেয়ালে চরকি কেটে বেড়াবে?

ঠিক পাঁচটা চল্লিশে ভেতরের ঘরে ডাক পড়তে লোকমান হাকিম অবিশ্বাসী চোখে ঘড়ি দেখল। নিজের অঙ্কটা কাঁটায় কাঁটায় মিলে যেতে সে বিস্মিত হলো।

ডাক্তারের চেম্বার আজ অন্যরকম। টেবিলটা আগে ছিল জানালার কাছে, সেটাকে সরিয়ে দেয়ালের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে, অন্যান্য আসবাবপত্রেরও জায়গা বদল হয়েছে। ঘরটা আগের মতো নেই, কিছুটা ঘিঞ্জিভাব এসে গেছে। বসামাত্র

বিলকিসের হাতব্যাগ থেকে পুরনো কাগজপত্র বের করতে লোকমান হাকিম ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাগজপত্র যেভাবে উঠে এল, সেভাবেই ওগুলো টেবিলের ওপর মেলে ধরতে ডাক্তার নিজামুদ্দিন প্রথমে লোকমান হাকিম, তারপর বিলকিস, আবার লোকমান হাকিমের দিকে চোখ ফেলে বললেন– হ্যাঁ। লোকমান হাকিম কথা খুঁজে পেল না। ডাক্তার কাগজপত্রগুলো দেখলেন, এক জায়গায় হাতের কলম দিয়ে গোল্লা আঁকলেন, আবার একই কায়দায় চোখ ফেললেন।

বিলকিস মাথা নিচু করে আছে। লোকমান হাকিম জড়ানো গলায় বলল– স্বপ্ন...। ডাক্তার কাগজপত্র উল্টেপাল্টে পুরনো রোগী শনাক্ত করতে চাইলেন যেন, তারপর মুখ তুললেন– স্বপ্ন দেখা এখনো চলছে?

–হ্যাঁ স্যার, কোনো উন্নতি নেই।

–শুধু রাতেই দেখেন? দিনে দেখেন না?

–দিনে-রাতে যখন তখন চোখ বুজলেই দেখে। একেক সময় একেক স্বপ্ন, আবার একই স্বপ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়েও দেখে। এমন উৎপাত স্যার, কী বলব, আমি পাগল হয়ে যাব। পরশু রাতে...

–ওনাকে বলতে দিন। রোজই দেখেন? দেখতে ভালো লাগে?

বিলকিস তেমনি মাথা নিচু করে আছে, ওই অবস্থায় সে মাথা নাড়ল।

–মুখে বলুন।

লোকমান হাকিমের ভেতরে রাগ জমতে লাগল। এত করে বোঝালো, তার পরও মুখে তালা মেরে আছে! এটা বিয়ের পিঁড়ি নাকি? নাকি, ওই ফরসা-লম্বা ওকে দেখতে এসেছে, এখনি অর্ধেকটা কালোজাম মুখে করে পালাবে? ডাক্তারের চেম্বার বলে, অনেক কষ্টে একটা ঘর্ঘরে, রাগী ধমক লোকমান হাকিম সামলে ফেলল।

-বলুন।

এবার বিলকিস মুখ তুলল। তাকিয়ে লোকমান হাকিম থ বনে গেল। বিলকিসের চোখের পাতা কাঁপছে, ঠোঁটের কোণ ঘেঁষে চোরাহাসি। বিলকিস যখন স্বপ্ন নিয়ে কথাবার্তা শুরু করে, তখন এ রকম ছায়াজমাট হাসিতে তার চোখ-মুখ ভরে ওঠে। কিন্তু এ সময় হাসিটার কী দরকার ছিল!

–ভালো লাগে?

–লাগে।

–খুব ভালো লাগে?

–খুউব।

–কখন দেখতে ভালো লাগে?

–যখন আসে।

–তার মানে সব সময় আসে না?

–চেষ্টা করলে আসে।

–চমৎকার! কী দেখতে সবচে' ভালো লাগে?

প্রশ্ন শুনে বিলকিসের হাবভাব দেখে মনে হলো উত্তরটা খুব লজ্জার, অনেকটা ওই ফরসা-লম্বার ঘটনার মতো। ডাক্তার এবার লোকমান হাকিমের দিকে ফিরলেন– কী দেখতে ওনার সবচে' ভালো লাগে?

প্রশ্নটা লোকমান হাকিমের জন্য কঠিন, তবু সে চেষ্টা করল– এক কথায় সবই ভালো লাগে। অসুখটা স্যার এখানেই, স্বপ্ন হলেই হলো। বিড়াল নিয়ে স্বপ্ন দেখে, আবার আমাকে নিয়েও দেখে, আবার ধরেন, এই যে এখানে এলাম, বলা যায় না, রাতে এটাও ভর করতে পারে। ঘুমের মধ্যে একজন মানুষের এত অত্যাচার কেন হবে? রাতটা তো স্যার ঘুমানোর জন্য, রেস্টের জন্য। সারা রাত পরিশ্রম করে যদি স্বপ্ন দেখতে হয়, তাহলে রেস্ট, ঘুম কখন হবে?

ডাক্তার যেন এতক্ষণে লোকমান হাকিমের প্রতি মনোযোগী হলেন। বললেন– আপনার স্ত্রীর সমস্যাটা কোথায়?

–বললাম যে স্যার।

–এখানে সমস্যা কোথায়? স্বপ্ন দেখা কী চাট্টিখানি কথা!

কথা শুনে লোকমান হাকিম ঢোঁক গিলল। লোকটা কী বলে! মনে হচ্ছে, এবারও সমস্যাটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। মনে তার অভিমানও হলো। এই মানুষটা সম্বন্ধে তার কত উঁচু ধারণা! এবারও যদি সমস্যাটা না ধরানো যায়? এদিকে এখন পর্যন্ত পরশু রাতের ঘটনার কথা বলাই হয়নি। সে কিছুটা বিরক্তিসহ বলে ফেলল– কিন্তু দিনে-রাতে মাথার মধ্যে ভনভন

নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে? পরশু রাতে...

—পরশু রাতে কি ভনভন টের পেয়েছিলেন?

পাশ থেকে বিলকিস ফিক করে হেসে উঠতে লোকমান হাকিম হতভম্ব হয়ে গেল। বিমূঢ় ভাবটা কাটাবার আগেই শুনল ডাক্তার বিলকিসের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করছেন– কী দেখতে সবচে' ভালো লাগে বললেন না?

—বাচ্চা।

লোকমান হাকিম এতই চমকাল, তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো গলাটা বিলকিসেরই। ডাক্তার আরেকটু সামনে ঝুঁকলেন। বিলকিস এবার পুরো জবাবটা শেষ করল– বাচ্চা দেখতে সবচেয়ে ভালো রাগে, পরীদের মতো ঝলমলে ডানাওয়ালা বাচ্চা। ধীরে ধীরে বিলকিসের চোখের পাতা কাঁপতে শুরু করল, ছায়া জমে উঠল চেহারায়। পরশু রাতে শেষ বারের মতো দেখা স্বপ্নটা আস্তে আস্তে, ভাঁজের পর ভাঁজ সে খুলতে লাগল।

বিলকিস শেষ পর্যন্ত পরশু রাতের স্বপ্নদৃশ্য বর্ণনা করতে শুরু করেছে দেখে লোকমান হাকিম হাঁফ ছাড়ল। কিন্তু মুহূর্তেই ভেতরে একটা উসখুস ভাব জেগে উঠল। বিলকিসের মা হওয়ার ব্যাপারটা ডাক্তারকে কীভাবে জানায়? কথাটা জানানো দরকার, কিন্তু কীভাবে বলে? আমার স্ত্রীর পেটে বাচ্চা, আমার স্ত্রী গর্ভবতী– বাক্য দুটো নিজের কানেই বেখাপ্পা লাগতে ভাবল ইংরেজিতে সুবিধা, মুখ থেকে বের করলেই হলো, অনুভূতিতে দাগ কাটে না। ভাবতে ভাবতে উপযুক্ত বাক্যটা মাথায় চলে এল। বিলকিস শেষ করামাত্র ডাক্তারকে একটা গোপন ক্লু দিচ্ছে এমনভাবে খুব আলগোছে বাক্যটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল– সি ইজ ক্যারিং।

ডাক্তার চোখ ফেরালেন, সেকেন্ড দুয়েক লোকমান হাকিমকে দেখলেন, কৌতুকে নাচছে দুই ভুরু, তারপর ঝুপ্ করে বললেন– ক্যারিং? আপনি জানেন, উনি কি ক্যারি করছেন?

ডাক্তার চুপ করে ভুরু নাচালেন, যেন সত্যিই জবাবের অপেক্ষা করছেন, তারপর রহস্যের গেরোতে কষে আরেকটা গেরো জুড়ে বললেন– সি ইজ ক্যারিং ড্রিমস, স্বপ্ন।

কথা শেষ করে ডাক্তার আবার বিলকিসের দিকে ঝুঁকলেন, থেমে থেমে অনকেগুলো কথা বললেন, যার মাথামুণ্ডু লোকমান হাকিম ধরতে পারল না। একবার শুনল বলছেন– স্বপ্নটা তুলনাহীন, এমন স্বপ্নের সাক্ষাৎ পাওয়া ভাগ্যের কথা, হাতের বদলে ডানাওয়ালা, পরীদের মতো ডানাওয়ালা বাচ্চা কে না চায়! বিলকিস খুব ভাগ্যবতী।

ঘরে ফিরে লোকমান হাকিম ঝিম ধরে বসে থাকল। মাথাটা তার ফাঁকা, ধু ধু হয়ে আছে। বিকাল থেকে কী-কী করল, কোথায় গেল, কীভাবে কাটাল কিছুই মনে দাগ কাটছে না। ফেরার পথে রিকশায় চুপচাপ বসে এসেছে। বিলকিসের সঙ্গে একটা কথাও হয়নি। ঘরে এসে বেতের চেয়ারে পা দুটো জড়ো করে বসে বসে মনে হলো রিকশায়ই বসে আছে। অনেকটা সময় পার করে সে উঠল। ছোট ঘরটায় পা টেনে টেনে কয়েকবার পায়চারি করল। এক টুকরো বারান্দা আছে ওপাশে, বারান্দায় গিয়ে এমনি এমনি দাঁড়াল, আবার ফিরে এল, বেতের চেয়ারটায়ই বসল। মাথাটা তার পরও ফাঁকা।

বিলকিস ঘরে এসে কাপড় বদলালো, নীল বুটিদার খুলে অন্য একটা শাড়ি পরল। রান্নাঘরে ঢুকে ডাল বসাল, তরকারি গরম করল, ভাত রাঁধল, আরো কী কী করল। রাত ন'টার দিকে ভাত বেড়ে দিতে লোকমান হাকিম চুপচাপ খেয়ে উঠে সোজা বিছানায় চলে গেল। মশারি খাটিয়ে শুতে এসে বিলকিস গজগজ করল– খামোখা পয়সা খরচ।

শেষরাতের দিকে লোকমান হাকিমের ঘুম ভাঙল। সচরাচর এটা হয় না, এক ঘুমেই তার রাত শেষ হয়। চোখ খুলে চারপাশ অন্ধকার দেখে তার খটকা লাগল, তার মানে সকাল হয়নি। এদিকে ঘুম ভাঙামাত্র বুঝতে পারল, মাথাটা আর ফাঁকা নেই, চিনচিনে যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। শারীরিক লক্ষণ বলতে কেবল মাথায় যন্ত্রণাই না, সে খেয়াল করল গা শিরশির করছে, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হচ্ছে, বুক জুড়ে অস্থির অস্থির ভাব।

ঘুমটা চোখে থেকে পুরোপুরি কেটে যেতে সে পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হলো, আর তখনি অবিশ্বাস্য আবিষ্কারে হতভম্ব হয়ে গেল। এইমাত্র সে একটা স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে। সে দেখেছে বিলকিসের একটা বাচ্চা হয়েছে, ছেলে বাচ্চা, ছেলেটা দেখতে হুবহু তার নিজের মতো, কালোকুলো, গর্তে বসা চোখ। ঘাড় কাঁধ বুক অসম্ভব চওড়া। সবে জন্মানো বাচ্চাটার কপাল জুড়ে অবিকল লোকমান হাকিমের মতো ছোটবড়, নানা মাপের বসন্তের দাগ। স্বপ্ন বলতে এইটুকু, কিন্তু তার মনে হলো, অনেকটা সময় ধরে একটু একটু করে সে স্বপ্নটা দেখেছে। বারকয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে স্বপ্নটা নিয়ে ভাবল। আর তাতে বুক জুড়ে অস্থিরতাটাও বাড়ল, ভীষণ পিপাসা পেল। অন্ধকার বিছানায় একসময় সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

জীবনে প্রথম একটা পরিপূর্ণ স্বপ্ন দেখার আতঙ্ক নিয়ে লোকমান হাকিম উঠে বসল। বিছানার এক পাশে বিলকিস ঘুমাচ্ছে, হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করা। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না, ভারি শ্বাসপ্রশ্বাসে হাঁটু-গোটানো দুই ভাঁজ শরীর অল্প অল্প দুলছে। স্বপ্ন দেখার পর বিলকিসের যেমন হয়, একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যায়, চোখের পাতা কাঁপে, ছায়া জমে ওঠে চেহারায়,

তার তেমন কিছুই হলো না। বরং বুকটা খুব দ্রুত ওঠানামা করছে, হাঁসফাঁস লাগছে। এও কি স্বপ্ন? খাট থেকে নেমে লোকমান হাকিম অন্ধকারে পা ঘষে-ঘষে স্পঞ্জের স্যান্ডেল খুঁজল, না পেয়ে খালি পায়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। ঘাড় ঘুরিয়ে মশারির চৌকোনা চাঁদোয়াটা আবছাভাবে দেখল, চাঁদোয়ার নিচে বিলকিসের শরীরের ভেতর তালগোল পাকানো তিন মাসের বাচ্চাটার জন্য এক আশ্চর্য, অচেনা মমতা অনুভব করল।

পরের দুটো দিন অন্যরকম গেল। অফিসে বসে একটু পরপর সে আনমনা হলো। কাজকর্মে মন বসাতে পারল না। নিজের স্বপ্ন দেখার ঘটনাটা যতবার মাথায় এল, ততবারই সে নতুন করে বিভ্রান্ত হলো। ঘরে ফিরেও স্বস্তি পেল না। রাতে বালিশে মাথা রাখতে গিয়ে ভয়ে শিউরে উঠল।

তৃতীয় রাতেও লোকমান হাকিম হাঁসফাঁস করে জেগে উঠল। তার বুক ধুকপুক করছে, দম আটকে আসছে। অবিকল একই স্বপ্ন। কদাকার শিশুটা চিৎ হয়ে শুয়ে হাত-পা ছুড়ছে। হুবহু তার নিজের মুখ, গর্তে-বসা বিবর্ণ চোখ, কপাল জুড়ে ছোটবড় ক্ষত। ঘুমের মধ্যে সে হয়তো চিৎকার করে উঠেছিল। চোখ খুলতেই দেখল, বিলকিস ঝুঁকে আছে মাথার ওপর। বিলকিস ঘুম জড়ানো গলায় জানতে চাইল কী হয়েছে? লোকমান হাকিম জোরে শ্বাস নিল, গুমোট ঘরেও বুক ভরে উঠল ঠাণ্ডা বাতাসে। বাতাসটা বুকের আনাচেকানাচে খেলিয়ে লম্বা নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে লোকমান হাকিম ভাবল, বিলকিসকে সে কী বলে! একবার ভাবল, বলে– স্বপ্ন। কিন্তু তার কষ্ট হলো। এই কষ্ট অচেনা, এত দিন কোথায় লুকিয়েছিল মাথায় এল না। স্বপ্ন দেখার সঙ্গে এই কষ্টের ব্যাপারটা কী করে জুটে গেল! তার রাগ হলো না, গা শিরশির করতে লাগল।

বিলকিস আবারো কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতে লোকমান হাকিম অসহায় বোধ করল। এক মুহূর্ত সে চোখ বুজে ভাবল, এইটুকু বাচ্চা, না হয় চোখদুটো গর্তে বসা, ঘাড়-পিঠ অসম্ভব চওড়া, না হয় ডানা নেই, দেখতে কুৎসিত– তারই মতো, কিন্তু কপালে এই দাগগুলো কেন, এগুলো কোত্থেকে এল? গলার ভেতরে কী একটা জট পাকিয়ে উঠছে। লোকমান হাকিম ভেবে পেল না এ অবস্থায় বিলকিসকে তার কী বলার আছে! বিলকিসকে কি বলা যায়– সে একটা স্বপ্ন দেখেছে, তার নিজস্ব স্বপ্ন। স্বপ্নটা সে দেখতে চায় না, এখন যদি বিলকিস তার স্বপ্নটা লোকমান হাকিমকে দেয়, একবার দেখতে দেয়!